অন্ দি ভল্গা

রোমানফ্

অনুবাদক

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

তৃতীয় সংস্করণ

আশ্বিন, ১৩৪৯

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু
কর্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ২৮, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় অগ্রজ

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সান্যাল

শ্রীচরণেষু—

প্রসিদ্ধ রুশীয় কথা-সাহিত্যিক রোমানফের "On the Volga" ও "Without Cherry Blossoms" থেকে গল্পগুলি নেওয়া। মূলের মাধুর্য ও সৌন্দর্য অনুবাদে অক্ষুন্ন রাখা একান্ত দুরূহ। কতদূর সফল হয়েছি তা সুধী ও রসজ্ঞ পাঠকদের বিচার্য। গল্পগুলি যদি তাঁদের কিছুমাত্রও আনন্দ দিতে পারে তা'হলে পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

অন্ দি ভল্‌গা

ভল্‌গার উঁচু তীরভূমির পশ্চাতে সূর্য অস্ত গেছে। বিস্তৃত জলরাশির অর্ধেকটা জুড়ে ছায়া ঘনীভূত, কিন্তু পরপারে নদীর বুকে তখনও একটু গোলাপী আভা জড়ানো রয়েছে।

নদীর ঢালু তটভূমির উপর ছোটখাট বার্চ গাছের ডালে ডালে ফুলের সমারোহ। বসন্তের আকাশের নীচে গাছগুলোকে বেশ স্পষ্ট মনে হচ্ছিল। অস্তগামী সূর্যের রঙীন আলোর ছোঁয়াচ লেগে বার্চের কুঁড়িগুলোও রক্তিম হ'য়ে উঠেছে।

সবেমাত্র বসন্তের আবির্ভাব। নদীর বুকে জলের স্ফীতি ভরাস্রোতে উচ্ছ্বসিত হয়ে নীরবে বয়ে চলেছে। দূরের ছোট দ্বীপ আর তীরের কাছেকার পাহাড়গুলোর পায়ের কাছে দু একটা আবর্ত মাত্র চোখে পড়ে। সূর্যের শেষ-রশ্মি ঠিক্‌রে পড়ায় আবর্তগুলোর বুকেও রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে। কাঁকর-বিছানো খাড়া তটভূমির উপর থেকে আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে চারজন লোক নীচের দিকে নেমে আসছিল। এদের তিনজন সৈনিকের পোশাক পরিহিত পুরুষ, আর বাকীটি একজন মহিলা—বরং একজন কিশোরী বলাই ভাল। মেয়েটির গড়ন পাতলা, গায়ে একটা ধূসর রঙের পোশাক—স্কুলের মেয়েরা সাধারণত যেমন ধরনের পোশাক ব্যবহার করে। একটা লম্বা 'স্কার্ফ' তার গলার চারদিকটা ঘিরে নীচের দিকে লতিয়ে নেমেছে।

যে দু'জন লোক আগে আগে পথ চলছিল তাদের উভয়ের কাঁধেই এক-খানা করে কোদাল। কেবল পিছনের লোকটির গায়ে রূপার তকমা

জড়ানো অফিসারের ইউনিফর্ম। তাঁর এক পাশ দিয়ে একটা হলুদ চামড়ার পিস্তলের খাপ নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। হাতের ভাঙা ছড়িটা দিয়ে অফিসারটি পথের উপরকার ছোট ছোট পাথরগুলোর উপর খেলাচ্ছলে আঘাত করছিলেন।

একটা খাড়া ঢালু জায়গায় এসে পৌছতেই ছড়িটার উপর নিজের ভর রেখে তিনি মেয়েটিকে নামতে সাহায্য করার জন্য তার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু মেয়েটি বেশ একটু সংকুচিতভাবে তাঁর স্পর্শ এড়িয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল। তার মুখে চোখে একটা বেদনার আভাস পরিস্ফুট।

'আমায় এতখানি অবজ্ঞা কর তুমি?'—একটু মুচকি হেসে অফিসার প্রশ্ন করলেন।

'কই—না।' মেয়েটি উত্তর দিল, 'অবজ্ঞার এতে কিছু নেই ত।'

—'যদি থাকৃত তাহলে বোধ হয় যথাসাধ্য চেষ্টা করতে, না?'

—'ওটা এখন থেকে অন্যদের জন্য তোলা রইল। আমায় স্পর্শ করবেন না, এইটুকুমাত্র আপনার কাছে আমার অনুরোধ। তার চেয়ে বরং ছড়িটা দিন আমি একলাই নেমে যেতে পারব।'

ছড়িটার উপর ভর দিয়ে মেয়েটি পাশ কাটিয়ে নীচে নেমে এল। একটা পা-ই সে বারবার সামনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল। তার ছোট্ট কোমল মুখখানার ভাব প্রতিমুহূর্তেই বদলিয়ে যাচ্ছে। নামতে গিয়ে পাছে পড়ে যায় এই ভেবে কখনও সে মৃদু মৃদু হাসছিল, আবার তক্ষুনি হয়ত মাথা তুলে এক মুহূর্তের জন্য থেমে—পরপারের দিগন্ত-বিস্তৃত নীলাভ অরণ্য আর বালুকাময় চড়াগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। প্রশস্ত নদীর নিস্তরঙ্গ বুকের উপর ভাঙা-চোরা রেখায় এরই মধ্যে ওখানটায় আলোকস্তম্ভের লাল আর সাদা আলো ঠিক্‌রে পড়ে ঝিক্‌মিক্ করছে।

এই সীমাহীন আকাশ,—নদী, দূরের ঐ অরণ্যকে নিজের মধ্যে মিশিয়ে নেবার একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রতি মুহূর্তেই তার চোখের উপর ফুটে উঠছে। বুকের উপর চেপে ধরার প্রচেষ্টায় হাতদুটো তার একবার নড়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত অশ্রুকণা তার দু'চোখে টলমল করছে। মনের জোরে দাঁতের উপর দাঁত চেপে ধরে কোন রকমে সে কান্না রোধ করল।

অফিসারটি তার দিকে ফিরে তাকাতে সে একটু মৃদু হাসতে পর্যন্ত চেষ্টা করল। বুকভাঙা বেদনা নিয়েও অন্যের কাছে নিজের দুর্বলতা ঢাকতে গিয়ে মানুষ যে রকম করে হাসে, এ হাসিও সেই রকমের।

'সেই চিঠিখানা লিখে আসতে পারিনি বলে ভারি চিন্তা হচ্ছে আমার' —মেয়েটি বললে।

'কি লাভই বা হত তাতে!' অফিসারটির কাছ থেকে উত্তর এল। 'জামা-কাপড় তুমি তেমন কিছুই আননি দেখছি। যা ঠাণ্ডা! ওখানে গিয়ে পৌছবার আগেই ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসবে দেখছি।'

অফিসারটির বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। মাথার চুলগুলো ভারি সুন্দর—দাড়ির নীচের দিকটা সরু ক'রে ছাঁটা,—কাঁধটায় বেশ একটা সবল দৃঢ়তার আভাস পরিস্ফুট। চামড়ার কোমরবন্ধটা কোমরের চারদিক ঘিরে বেশ লেপটে রয়েছে,—পায়ে পাতলা নরম বুট,—সব কিছু মিলে তাকে বেশ সুন্দর মানিয়েছে। বেশ সতেজ হাসিখুশিমাখা চেহারাটি।

মাঝে মাঝে মাথার টুপিটা খুলে খাটো করে ছাঁটা চুলগুলোর মধ্য দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে চারিদিকটা তিনি চেয়ে দেখছিলেন। গরমের দিনে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে মাথা ঘেমে ভিজে উঠলে যেমন করে মানুষ টুপি খুলে ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাটা মুক্ত করে দেয়—তাঁর হাবভাবেও সেই আভাস পরিস্ফুট।

নদীর কিনারে পৌছতেই সৈনিকেরা এসে একটা বড় নৌকার বাঁধন

খুলে দিল। বন্ধনমুক্ত হয়ে নৌকার শিকলটা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল।

অফিসারটি একটা মোটা হলুদ রঙের সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ পর্যন্ত জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠিটা আঙুলে চেপে ধরে রইলেন। আগুনের শিখা নিস্তরঙ্গ সান্ধ্য বাতাসের বুকে ধীরে ধীরে নিভে আসছিল।

'কি শান্ত!' জ্বলন্ত কাঠিটার দিকে দৃষ্টি ফেলে কি যেন ভেবে মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল—'হ্যাঁ, সন্ধ্যাটা ভারি চমৎকারই বটে।'

সৈনিকেরা নৌকার বাঁধন খুলে যেখানটায় অফিসার আর মেয়েটি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন সেই দিকে তার গলুইটা এগিয়ে দিল। মেয়েটিকে সাহায্য করতে অফিসার তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু এবারও সসংকোচে সে তাঁর দিক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। এক মুহূর্তের জন্য তার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল, এমন কি আতঙ্কে এক পা পিছিয়ে পর্যন্ত গিয়েছিল সে! কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে নৌকার উপর লাফিয়ে উঠে পড়ল। তাল সামলাতে নৌকাটা জলের উপর বেশ খানিকটা দুলে উঠল।

সৈনিকেরা তীর থেকে নৌকাটিকে জলের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেরা এসে লাফিয়ে নৌকায় উঠে পড়ল। দোল খেয়ে খেয়ে ধীরে ধীরে নৌকা-খানা জলের উপর স্থির হয়ে পড়েছে। দাঁড় ফেলে গতিটা স্থির করে না নেওয়া পর্যন্ত নৌকাখানা স্রোতের টানে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। নৌকার পিছনের দিকে মেয়েটি যেখানটায় গিয়ে বসেছে কোদাল দুখানাকেও তারই পাশে নামিয়ে রাখা হয়েছে। বসতে অসুবিধা হওয়ায় সে কোদাল-গুলোকে একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল।

'তোমার অসুবিধা হচ্ছে কি? তা হলে ওগুলোকে এদিকে এগিয়ে দাও'—অফিসার বললেন। তারপর সৈনিকদের লক্ষ্য করে,—'একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক এরা',—কথাটা উচ্চারণ করলেন।

"আর সবাই কোথায় ?'

'ঐ ওখানটায় আছে।' সামনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে অফিসার উত্তর দিলেন।

'কোথায় ?'

'ঐ দ্বীপে--যার বুকে কতকগুলো ঝোপ-ঝাড় আর বালু দেখছ না—ঐখানটায়—'

'কতক্ষণ লাগবে আমাদের ও জায়গায় পৌছতে ?'

'প্রায় মিনিট কুড়ি লাগবে আর কি।' একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে অফিসার উত্তর দিলেন।

'যিনি তদন্ত করবেন তিনিও কি ওখানে আছেন ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওখানে আছেন তিনি।'

মেয়েটি অফিসারের দিকে মুখ করে বসে ছিল। আর তিনি ছিলেন নৌকার সামনের দিকে উপবিষ্ট। হঠাৎ মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে দূরের ঐ অস্পষ্ট বালুকারাশি আর বেণুবনের দিকে অনেকক্ষণ ধরে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। তার চোখে মুখে সুদূরের ছায়া ঘনীভূত হয়ে নেমে এসেছে। তারপর ধীরে ধীরে চোখ তার নেমে এল দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির উপর। অস্তগামী সূর্যের অস্পষ্ট আলোর ছোঁয়াচ তখনও নদীর বুক থেকে মিলিয়ে যায় নি। উপরে নির্মুক্ত নীল আকাশের দিকে একবার দৃষ্টি মেলে শেষ পর্যন্ত ওপারে শিবিরের প্রজ্বলিত লাল অগ্নিশিখার উপর এসে তার চোখ দুটো থেমে গেল।

'চিরকাল এমনিই চলবে, ভাবতেও কি বিস্ময় লাগে।'—কথাটা বলতে বলতে মেয়েটি ঠোঁটটাকে এবার দাঁত দিয়ে চেপে ধরল। তার চোখ দুটো কেমন যেন একটু সংকুচিত হয়ে উঠেছে।

'কি চলবে চিরকাল ?'

'এই সব কিছুই'—হাত দিয়ে সে এমন একটা ভঙ্গী করল যেন নদী, আকাশ আর দূরের ঐ আবছা অরণ্য সব কিছুকেই সে বুক দিয়ে আলিঙ্গনে বেঁধে নিতে চায়। এক মুহূর্তের জন্য চোখ দুটি তার অশ্রুভারে টলমল করে উঠল।

স্রোতের টান বাঁচিয়ে তালে তালে দাঁড় ফেলে সৈনিকেরা ওপারের দিকে নৌকাটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এদের একজনের চুল রুক্ষ—ভ্রূগুলো এরই মধ্যে সাদা হয়ে উঠেছে, হাতের উপরকার লোমগুলো সাদাটে। তার মাংসল মুখটাকে বেশ ভরাট বলে মনে হচ্ছে—কাঁধটাও বেশ প্রশস্ত আর দৃঢ়। স্রোতের টানে নৌকাটা যখনই ভাঁটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, দড়ির ফাঁসে দাঁড়টাকে ঠিক করে নিয়ে সে মাঝে মাঝে থুথু দিয়ে হাতের তালু দুটোকে ভিজিয়ে নিচ্ছিল। লোকটার সমস্ত মুখে চোখে একটা অনাবিল সরল হাসির আভাস পরিস্ফুট। দেখলেই মনে হয় স্বাস্থ্য আর শক্তিতে দেহটা তার ঝলমল করছে। মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকে চোখ মেলে তাকাচ্ছিল সে—বিশেষ ক'রে তার গলায় জড়ানো স্কার্ফটার দিকে। স্কার্ফটা ওর খুব মনে ধরেছে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় সৈনিকটি একটু গম্ভীর প্রকৃতির। প্রথমটির সঙ্গে কোনই সাদৃশ্য নেই তার। নাকের উপর থেকে একটা কাটা দাগ কপালের মধ্য দিয়ে সোজা উপরের দিকে উঠে যাওয়ায় চেহারাটাকে তার আরও রুক্ষ আর বিষণ্ণ বলে মনে হচ্ছিল।

'এমন কাজটা করতে গেলে কেন? এমন একজন একনিষ্ঠ বলশেভিক হয়ে এ কাজ করাটা কি তোমার ভাল হয়েছে?'—অফিসার প্রশ্ন করলেন।

'আমি ত আর মারতে চাই নি; পা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলাম যাতে লোকটার হাত ছাড়িয়ে সে বেঁচে আসতে পারে।'

'আর লাগালে ওর মাথায়!'

'লক্ষ্য ভুল হল যে।'

'ভারি চমৎকার ভুল ত!'—মেয়েটির দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে অফিসার বলে উঠলেন।

'চিঠিটা না লিখে আসাটা ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার।' প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই মেয়েটি এই কথাটি বলে উঠল।

'আমি যতদূর জানি ফ্রন্টিয়ার থেকে সে বোধ হয় মস্কোতে এসে গেছে।' অফিসার উত্তর দিলেন। উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি তাঁর চোখে ফুটে উঠল।

'তাতে কিছুই আসে যায় না। সে যেখানেই থাক চিঠি তার কাছে গিয়ে পৌঁছতই।'

'কিন্তু এ ভেবে এখন আর লাভ কি, বল।'

'আপনিই ঠিক'—মাথাটাকে একটু নীচু করে সে কথাটার জবাব দিল—যেন কিছু চিন্তা করল। তারপর হঠাৎ নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে মাথা তুলে সে একবার বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চারিদিকটা ভাল ক'রে চেয়ে দেখল।

'জলের গন্ধ টের পাচ্ছেন?' মেয়েটি বলল, 'ভারি মিষ্টি একটা হাওয়া দিচ্ছে, অনুভব করছেন না? বসন্তের স্পর্শ পেয়ে জীবন যেন জেগে উঠেছে, নয়? জীবন'…সে এমন ভাবে বার বার শব্দটি উচ্চারণ করল যেন এর মধ্য থেকে একটি নূতনত্ব খুঁজে পেতে চায়। নিজের সংবদ্ধ হাত দুটিকে সে এমন জোরে চেপে ধরল যে আঙুলের ডগাগুলো পর্যন্ত তার মড়মড় করে শব্দ করে উঠল।

অফিসারটি নিঃশ্বাস টেনে বাতাসটাকে যেন একবার অনুভব করতে চেষ্টা করলেন। তারপর চারিদিকে চাইতে চাইতে সিগারেটের কেস্‌টা হাতে তুলে নিলেন। 'হ্যাঁ এপ্রিল মাস', তিনি বলে চললেন, 'ধীরে ধীরে পৃথিবী জাগছে।'

ওপারের সংকীর্ণ বালুরেখার দিকে নৌকাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। মেয়েটির দৃষ্টিও সেই দিকে নিবদ্ধ। চোখে মুখে তার অদ্ভুত ধরনের ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠেছে। লোভী দৃষ্টি মেলে একটার পর একটা সব কিছুর উপর দিয়েই সে দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছিল। জীবনের এই জাগরণকে সে যেন কড়ায় ক্রান্তিতে অনুভব করে যেতে চায়।

'দেখুন, দেখুন, কি সুন্দর একটা প্রজাপতি!' উপরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে কথাটা বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ছেলেমানুষির কথা মনে করে কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল। ছেলেবেলায় ওদের ধরতে ভারি ভাল লাগত। চোখভরা ঔৎসুক্য নিয়ে সে আবার বলে চলল, 'প্রজাপতি ধরায় কি যে আনন্দ!'

ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা চেপে রেখেই অফিসারটি একটুখানি মৃদু হাসলেন। তারপর একটু ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তিনি তার দিকে চেয়ে দেখলেন।

'আমাদের মধ্যে তুমিই দেখছি একেবারে শিশু রয়েছ এখনো'…

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আমার মত অবস্থায় পড়লে এর অর্থ বুঝবেন। আমার কথাও মনে পড়বে তখন।'

'তুমি কি মনে কর তোমার এই অবস্থায় আমাকেও একদিন পড়তে হবে?'

'আমার অন্ততঃ সন্দেহ নেই তাতে'…বেশ একটু সোজা হয়ে বসে নিয়ে সে কথাটার জবাব দিল।

ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি টেনে অফিসার প্রশ্ন করলেন, 'কখন আসবে সে সময়?' অবজ্ঞায় তার চোখের কোণ দুটো বেশ একটু সংকুচিত হয়ে উঠল।

'আজ থেকে মাসখানেকের মধ্যেই হয়ত—জেনে রাখবেন।'

'ওঃ, একেবারে ত্রিকালজ্ঞ দেখছি!' নিঃশেষিত সিগারেটের শেষ প্রান্তটা ঠোঁটে চাপতে চাপতে প্রকাশ্যভাবেই অবজ্ঞায় তিনি মেয়েটির দিকে চোখ তুলে তাকালেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'সে যাক্‌, এর পরেও কিন্তু তোমার প্রশংসা না করে আজ আর আমি থাকতে পারছি না। কেন না আমার সমস্ত জীবনেও এমন আর একটা ব্যাপার আমি দেখিনি। খুনী, ডাকাত, জোচ্চোর যারা তাদের ব্যবহার দেখেই চিনতে পারি—তারা খুন করে, বলাৎকার করে···কোন সৌন্দর্যবোধই নেই তাদের। কিন্তু তুমি—সত্যি তুমি অদ্ভুত!'

'অদ্ভুত আবার কি?' মেয়েটি উত্তর দিল, 'এই মুহূর্তেও আপনার প্রতি ভাল ব্যবহার ত আর করিনি। তা সত্বেও এই যে আপনি আমার প্রশংসা করতে পারছেন এই কি আমার পক্ষে কম? এতে আমাকেও আপনার প্রতি ভাল ব্যবহার করতে অনেকখানি সাহায্য করছে। নইলে এইমাত্র আপনি যাদের কথা বলছিলেন আমি যে প্রায় তাদেরই মত কাজ করতে যাচ্ছিলাম আর কি।'

অফিসার একটু শ্লেষের সঙ্গে মাথাটা নাড়লেন। 'তাহলে এটা তোমার জোর করে দেখানো সাহস, কেমন?'

মেয়েটি বেশ সোজাভাবেই উত্তর দিল, 'আমি নিজেই বুঝতে পারছি না এ যে কি? কেউ যদি আমায় বলতো যে, এই অবস্থায় আমি এখন যেমন ব্যবহার করছি ঠিক এমনি ব্যবহারই করেছিলাম, তাহলে হয়ত আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারতাম না। এ যে কি আমি নিজেই ধরতে পারছি না।·········এই ত এক সঙ্গে আমরা নৌকায় করে ভেসে যাচ্ছি—সব কিছুই স্বাভাবিক; এমনি ঘটনা এর আগেও হয়ত হাজার বার ঘটেছে, কিন্তু এ নিয়ে কোন চিন্তাই করিনি কেউ কোন দিন। দাঁড় থেকে ফোঁটা

ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে······একঘণ্টা পরেও ফেরার পথে এমনি করেই দাঁড়গুলো জল কাটবে ; নৌকাটা তীরের দিকে এগিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘাটে এসে থেমে পড়বে···এই কথাগুলোই যখন কেউ ভাবে তখনই অদ্ভুত মনে হয়। এই জন্যই ত বলছিলাম যে ব্যাপারটা বুদ্ধির অতীত—অদ্ভুত।'··· কথাটা শেষ হতেই তার সমস্ত শরীরটা কেমন যেন একবার কেঁপে উঠল।

'এইত আমরা পৌঁছে গেছি।'···বাঁশবনের মধ্য দিয়ে নৌকার গলুইটা বালুকাময় তীরের উপর এসে ধাক্কা খেতেই অফিসার বলে উঠলেন। তারপর আস্তে লাফিয়ে তীরে নেমে তিনি মেয়েটির দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলেন। চড়ুইভাতির অভিযানে বেরিয়ে কোন যুবক যেমন ভাবে নৌকা ধরে হাত বাড়িয়ে মেয়েদের নামতে সাহায্য করে তাঁর ধরনটাও প্রায় সেই রকমই।

মেয়েটি সংকুচিতভাবে নিজেকে পিছনের দিকে সরিয়ে নিল। ওর সমস্ত চেহারাটাই কেমন যেন পাংশু বিবর্ণ হয়ে গেছে। অফিসারের প্রসারিত হাতটা এড়িয়ে সে সমস্ত শক্তি দিয়ে নৌকা থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে পড়ল। ভিজে বালুর মধ্যে পা ডুবে যাওয়ায় ওর জুতোর লেসের গর্তগুলোর মধ্য দিয়ে খানিকটা বালু এসে ভিতরে ঢুকে পড়ল। স্কার্ফটা দিয়েই সে বালুগুলি ঝেড়ে ফেলছিল।

রুক্ষ চুলওয়ালা সৈনিকটি করুণদৃষ্টি মেলে স্কার্ফটার দিকে চেয়ে দেখছিল।

'এটা নাও তুমি—আর ফিরিয়ে দিতে হবে না।'

সৈনিকের হাত থেকে স্কার্ফটা ছিনিয়ে নিয়ে অফিসারটি বলে উঠলেন—'অনুমতি নেই। ফিরিয়ে নেও ওটা।' কথাগুলি এবার তাঁর অপ্রত্যাশিত রকম কর্কশ।

'তোমরা এখানেই অপেক্ষা কর—আমরা ওদের সবাইকে খুঁজতে

যাচ্ছি। সৈনিকদের লক্ষ্য করে কথাটা বলেই তিনি তাদের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে কি জানি একটা ইঙ্গিত করলেন।

'অনেক দূর যেতে হবে কি আমাদের—কতক্ষণ লাগবে?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

'প্রায় দশ মিনিট—হয়ত মিনিট পনরও হতে পারে। স্কার্ফটা বেশ করে জড়িয়ে নাও; ভারি স্যাঁৎসেঁতে জায়গা কিনা, ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসবে আবার।'

তারা চলে গেল।

একটা ঝোপের আড়ালে মেয়েটির ঘাড়ের ঠিক পিছনটাতে তিনি গুলি ছুঁড়লেন। পিছনে যেতে যেতে দু-দুবার অফিসার তার দৃষ্টি এড়িয়ে খাপ থেকে রিভলবারটা বের করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দুবারই তাঁকে আবার হাত সরিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় বার? উপরে সান্ধ্য আকাশের দিকে চেয়ে মেয়েটি যখন বলছিল—'কি বিরাট প্রশান্তি—এর আগে এমন করে এ আর আমি অনুভব করতে পারিনি'—অফিসার তাড়াতাড়ি করে রিভলবারটা দিয়ে তার ঘাড়ের ঠিক পিছনটা লক্ষ্য করলেন।

গুলির শব্দটা তেমন কিছু শ্রুতিগোচর হওয়ার মত নয়। ছোট্ট দ্রুত একটুখানি শুকনো শব্দ মাত্র। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরতে ফিরতে কোন মেষ-পালক দূর থেকে তার চাবুকটা দিয়ে যেন খট্ করে একটা শব্দ করল।

সঙ্গে করে যে কোদালগুলো আনা হয়েছিল, তারই সাহায্যে তারা মেয়েটির দেহটাকে বালুর মধ্যে সমাধিস্থ করল। তার স্কার্ফটাও তারই সঙ্গে সঙ্গে মাটীর নীচে চাপা পড়ল। সৈনিকটি কিন্তু সারাক্ষণ ধরেই সেই স্কার্ফটার দিকে চেয়েছিল। এমন কি ওটা নিতে পারবে কি না

অফিসারকে এ কথাটা জিজ্ঞেস করতেও সে ভুল করেনি। কিন্তু অফিসারের দৃষ্টি লক্ষ্য করেই সে কেমন যেন অপ্রতিভভাবে নীরব হয়ে গেল।

* *

নৌকায় করে তারা যখন আবার ফিরছিল তখন অন্ধকার বেশ নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে উঠেছে। দাঁড়গুলো তালে তালে উঠছে নামছে। জলের উপর দিয়ে কতকগুলো ফড়িং ইতস্ততঃ ছুটোছুটী করে বেড়াচ্ছিল। তারা মাঝে মাঝে দৃষ্টি মেলে ফড়িংগুলোর খেলা চেয়ে দেখছিল। অন্য তীরে শিবিরে আগুনের রক্তাভা তখনও বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। খানিকক্ষণ আগেও একটি মেয়ে স্থিরদৃষ্টিতে ঐ অগ্নিশিখার দিকে চেয়ে দেখছিল।

সব কিছুই আগের মত—কোনই পরিবর্তন নেই, কেবল নৌকার পিছনটায় কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক শূন্যতা জেগে উঠেছে।

দুঃখ

আবার সেই একঘেয়ে নিঃসঙ্গ জীবন। নাগরিক জীবনের কোলাহল সত্যি ভারি বিশ্রী। মাঝে মাঝে মন হাঁপিয়ে ওঠে। সীমাহীন মানুষের মধ্য থেকে এই বনের ধারে এসে তৃপ্তি পাই।

বনের পিছনে অনেকটা জমি ফাঁকা। ওখানে সাদা চিমনি মাথায় করে মস্ত একটা পুরনো বাড়ী। ওর জানালার নীচে বার্চ গাছের শাখা মাথা তুলতে শুরু করেছে। পাইন গাছের মৃদু মর্মর ওকে ঘিরে কেবলই উপ্‌চে ওঠে। ওর পিছন দিয়ে একটা পায়ে চলার পথ, বনের মধ্যে কোথায় যেন পথ হারিয়েছে। মানুষের সাড়া শব্দ নেই।

এমনি ধারা একটা জায়গার প্রয়োজনীয়তাই আজ আমাকে নিবিড় করে পেয়ে বসেছিল। তাই এর অস্তিত্বে মন আমার তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। মন যখনই হাঁপিয়ে ওঠে—তখনই চাই তার এমনিধারা একটু আশ্রয়, মনকে সজীব করে তুলতে।

ওরা আমাকে খুব নিবিড়ভাবেই গ্রহণ করেছে। অতিথির উপর ওদের যেন আর দরদের অন্ত নেই। আমার মধ্য দিয়ে কি এক পরিবর্তনের আভাস নাকি ফুটে উঠেছে। আমি যেন আর আগের মানুষ নই। অন্ততঃ এই ওদের মত। কোন একটা বিরাট ক্ষতির আশঙ্কা করে ওরা আমায় প্রশ্ন করে।

এমনি ধারা প্রশ্ন সত্যি ভারি বিশ্রী। ওদের দৃষ্টি এড়াতে জানালার পাশে এসে দাঁড়াই। মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—যেমন ছিলাম আজও ঠিক তেমনি আছি—পরিবর্তন যা একটু হয়েছে তা দুদিনেই কেটে যাবে।

পত্রহীন বার্চ গাছের মাথায় সোনালীর আমেজ রেখে বসন্তের সূর্য অস্ত

যায়। ঘরের জানালায় এসেও সেই রঙীন আলোর ছোঁয়াচ লাগে;—বুঝি-বা দূরের ঐ পাইন বনের শাখায়ও।

দরজার পিছন থেকে একটা বন্দুক কুড়িয়ে নিয়ে বনের পথে বেরিয়ে পড়ি।

এপ্রিলের বাতাস বসন্তের ছোঁয়াচ লেগে মদির হয়ে উঠেছে। ঢালু জায়গাগুলো থেকে বরফ এখনও গলে শেষ হয়ে যায়নি। ছোট্ট নদীর মৃদু কল্লোল বেশ স্পষ্ট করেই শোনা যায়।

একটা বুড়ো বার্চ গাছের গায়ে বন্দুকটা ঠেকিয়ে রাখি। ওখান থেকেই পথটা বনের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির উপর আন-মনা হয়ে বসে পড়ি। বনের ওপারে সূর্যটা অনেকখানি নেমে এসেছে। পত্রহীন পপলার গাছের মাথায় লেগে অনেকগুলো সূর্যরশ্মি নীচেকার ঐ ঝরণাটার বুকে এসে ঠিক্‌রে পড়ে। বরফের চাপ গলে গলে ঐ ছোট্ট ঝরণার সৃষ্টি।

বুকের কাছে জামার নীচে একটা কাগজের খস্ খস্ শব্দ। ছোট্ট এই কাগজটুকু চিঠি হয়ে সেদিন আমার কাছে এসেছিল। পকেটে ফেলে রেখেছি তাই আজও ওটা সেখানে রয়েছে। জামার চাপ লেগে লেগে খামটা ইতিমধ্যেই অনেকটা মুচড়ে গেছে।

চিঠি···। এমনি ধারা চিঠি হয়ত জীবনে আর একটাও মিলবে না।

বসন্তের নিস্তব্ধতায় পুরনো পথের বুক বেয়ে কি যেন একটা সম্ভাবনার স্বপ্ন ভেসে আসে। অজানা বেদনার ছোঁয়াচ লেগে মন কেমন যেন ভারি হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটা শব্দ আজ আমার কাছে অর্থময়। কান পেতে বসে আছি। মনে হচ্ছে না-জানি কিসের প্রতীক্ষায় সময় আমার বয়ে চলেছে।

বনের মধ্য থেকে একটা পাখী হঠাৎ চীৎকার করে ডেকে উঠল। ভিজে মাটীর গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। উইলো গাছের ফুল থেকে

একটা মিষ্টি গন্ধের আমেজ পাচ্ছি। পথের ধারে ধারে ওদের গন্ধ আরও বেশি করে জমাট বেঁধেছে। পথ চলতে ওই হলুদ ফুলগুলোর নরম গন্ধে মন আমার চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বসন্তের প্রথম প্রকাশ……। বুকের কাছেকার চিঠিটা মুখর হয়ে উঠেছে। জীবনের পরিপূর্ণ দিনগুলো শুধুই ক্ষণিকের। সেদিন সুন্দরের স্বপ্নে মন মশগুল হয়েছিল; কিন্তু আজ সুন্দর বিদায় নিয়েছে। জীবন ঘিরে আজ শুধু ব্যথা আর বেদনা—হতাশার ব্যর্থতা। সুন্দরের স্বপ্নে মানুষের তৃপ্তি। কেউ বা আবার হারানো স্মৃতির মধ্যেই খুঁজে পায় আনন্দের পরিপূর্ণতা।

চিন্তায় মন ভারী হয়ে ওঠে। বহুক্ষণ ধরে দূরের ঐ অন্ধকার আকাশটার দিকে চেয়ে থাকি। ঘুমে ভরা নিশ্চল বনটা আমার চোখের আগে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ কখন এক সময় অন্ধকার পথের বুক বেয়ে বাড়ীর পানে মুখ ফিরাই।

আকাশের নীল খিলানে তখন শিশু চাঁদের কচি হাসি ফুটে উঠেছে।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেসে অনেকগুলো মেঘ আজ আকাশে ভিড় জমিয়েছে। রাতের দিকে ভারী এক পশলা বৃষ্টি এলো। জানালার খড়খড়িতে বৃষ্টি ঝরার শব্দ পাচ্ছি। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালার কথা মনে হ'ল। বাইরে হু-হু ক'রে ঝড়ো হাওয়া বইছে।…

উনুনে আঁচ দিয়েছি। টেবিলের গায়ে—চেয়ারের পায়ে ওর রাঙা আলোর ছোঁয়াচ লাগল। ঘরময় পায়চারী করে বেড়াচ্ছি। চুল্লিটার পানে চেয়ে কেবলই ভাবছি—কই, তেমন কিছুই ত হয়নি। ছোট্ট একটু ঘটনা, তাই নিয়ে আবার এত চিন্তা। অবসরের ফাঁকে দুদিনেই স্মৃতির দাগ মন থেকে মুছে যাবে। কিন্তু হায়, এই ছোট্ট ঘটনাটিকে ঘিরেই আজ

যত ব্যথার আনাগোনা। আশা নেই বলেই বুঝি বেদনা এমন নিবিড় হয়ে ওঠে।

বসন্তের হাওয়ায় সবারই মন এমনি ধারা উতলা হয়। নিঃসঙ্গ জীবনের পরতে পরতে কিসের অভাব বেদনার মত গুমরে কাঁদে। মানুষ ভাবে কোথায় ব্যথা—কূল পায় না।

সাত দিন আগে আমার মনেও ঠিক এমনি একটা অভাবের সাড়া পাচ্ছিলাম। উদ্দেশ্যহীনের মত শহরের পথে বেরিয়ে এলাম। সামনেই একটা উঁচু লাল বাড়ী। এ পথ দিয়ে অনেকদিন আমি পাড়ি জমিয়েছি।

ঐ বাড়ীটার সঙ্গে আমি খুবই পরিচিত। তিন বছর আগে এক ঝড়ের দিনে ওর বুকে আশ্রয় পেয়েছিলাম। পৃথিবী জুড়ে সেদিন বসন্তের মধুৎসব। বিকালের দিকে হঠাৎ আকাশটা ভয়ানক কালো হয়ে এল। আকাশের অমন বিশ্রী কালো চেহারা আর কোন দিন দেখিনি। দেখতে দেখতে সূর্যটার লাল মুখও ভয়ে কালো হয়ে গেল। আকাশ ভেঙে এরই মধ্যে বাজ পড়তে শুরু করেছে। উঃ—কি সে দারুণ শব্দ! বিদ্যুতের ঝিলিক লেগে চোখের দৃষ্টি ঝলসে যাচ্ছিল। তার উপর বৃষ্টি। এমন দুর্যোগেও সেদিনের মনে দাগ লাগেনি—হয়ত বা একটু লাগতেও পারে। আজ সেই ঝড়ের দোলা আমায় মাতাল করে তুলেছে। মনে কেবলই প্রশ্ন উঠছে—কেন? আশার দীপ নিভে চোখের দৃষ্টি কালো হয়ে এল, তবুও ব্যাকুলতা! বাড়ীটার দিকে চোখ তুলে চাইতেই হঠাৎ কখন থেমে গেলাম···। আজের ব্যর্থতা সেদিনও সত্য ছিল কিন্তু ভাবতে পারিনি। আজ সব কথা সত্য হয়ে বুকের কোণে ঘনিয়ে উঠেছে।

বৃষ্টির ভেজা গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। টেবিলের উপরকার ফুলদানি থেকে একটা বুনো ফুলের গন্ধ সিল্কের মত নরম আঁধারকে গন্ধময় করে তুলেছে। হাতের মধ্যে একটা নারী-দেহের

নিবিড় স্পর্শ অনুভব করছি। বাইরের আকাশে বাজপড়ার শব্দ শুনে মেয়েটির চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। কিন্তু কই, সেদিন ত আজের মত মন উতলা হয়ে ওঠেনি। দুর্ভাগার ভাগ্যে ঠিক এমনি হয়।

ঐ একই পথের উপর পরের দিনও আবার তার সঙ্গে দেখা। দূর থেকে দেখেই ওকে চিনতে পেরেছি। ওর চলার ভঙ্গী আমাকে ঠিক তারই কথা মনে করিয়ে দিল। মুখের ছায়া—টুপির পিছনটাও যেন কত যুগের চেনা।

আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই লজ্জায় ওর গালদুটো রঙীন হয়ে উঠল। একটু ভয়ও হয়ত পেয়েছিল। কালো দস্তানা-পরা হাত দুটো তুলে ওর বুকটাকে হঠাৎ ও চেপে ধরল। উত্তেজনাকে দাবিয়ে রাখারই এই প্রচেষ্টা। মনে হ'ল—আমাকে দেখে হঠাৎ যেন ও কেমন ভয় পেয়ে গেছে।

ওকে আমার অভিবাদন জানালাম। ওর তরফ থেকেও ত্রুটি হ'ল না। দুজনের মধ্যেই কেমন যেন একটা সংকোচের ভাব। দুজনেই পাশাপাশি পথ চলছি, কিন্তু কেউই যেন কথা বলার হঠাৎ কোন সূত্র খুঁজে পেলাম না।

কেমন করেই বা কথা বলব। আর একজনের জীবনের সঙ্গে ওর জীবন যে আজ জড়িয়ে গেছে। আমার মত উদ্দেশ্যহীনভাবে সেও হয়ত একদিন এ বাড়ীতে ঢুকেছিল। কিন্তু আজ···? দৃষ্টির সমস্ত শক্তি দিয়ে সামনের বাড়ীটাকে একবার দেখে নিলাম। অতীতের দিনগুলো চোখের সামনে ঝলমলিয়ে উঠল।

ঐ ত দরজার পাশে সেই পিতলের হাতলটা। যেমন ছিল আজও ওটা তেমনি আছে—একটুও পরিবর্তন হয়নি।

দুজনেই পাশাপাশি চলছি। কারুর মুখেই কথা নেই। ভারি বিশ্রী লাগছিল। সংকোচের ভাবটা কাটিয়ে কথা আমিই প্রথম বললাম—আজকের এই উদ্দেশ্যহীন পথচলার কথা। সন্ধ্যাটা ভারী মদির। এতক্ষণ ঐ নদীর ধারে বসেছিলাম। উদ্দেশ্যহীনভাবে এখন এই রাস্তাটায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

প্রশ্ন হ'ল—'এত পথ থাকতে হঠাৎ এই পাশের রাস্তায় কেন?'

প্রশ্ন শুনে ওর মুখপানে তাকালাম। সেই একই দৃষ্টি। আমার দিকে ও মুখও ফিরাল না। নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি রেখে ও এগিয়ে যাচ্ছিল। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার ভয়েই যেন ওর দৃষ্টি মাটীর দিকে আবদ্ধ। আমরা ততক্ষণ সেই লাল বাড়ীটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।

উত্তর দিলাম—'দিনটা ভারি নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। মানুষের সান্নিধ্য পেতে তাই পথে বেরিয়ে এলাম।'

দরজার হাতলটা ধরে ও আমার পানে মুখ তুলে চাইল।

কথার সঙ্গে ওর দৃষ্টির কোন মিল পেলাম না—আগের মত করেই যেন ও আমার দিকে চেয়ে আছে। বড় বড় চোখ দুটোর মধ্যে সে কি রহস্য! দরজা ডিঙিয়ে দুজনেই ভিতরে ঢুকে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে দু-এক পা মাত্র উঠেছি। ওখানে সেই পিনের দাগগুলো আজও রয়েছে। ওকে বাসায় না পেলে ওখানে আমার আগমন সংবাদ রেখে যেতাম। আর একধাপ সামনে যেতেই পিছন থেকে ও আমায় ফেরার আভাস জানাল। হঠাৎ মুখ যেন ওর কেমন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। অবাক হয়ে আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

'ভিতরে অন্য কেউ আছে।' স্বরটা ওর কেমন যেন কেঁপে গেল।

অন্য লোকের কথা সত্যি তখন আমার মনেও ছিল না। দুজনেই দরজার পাশে থমকে দাঁড়ালাম। কারুর মুখেই কথা নেই। বাড়ীর

ভিতরে অন্য লোকের আবির্ভাব যেন আমি কল্পনাই করতে পারছিলাম না। ঐ ত দরজার পাশে সেই পিনের দাগগুলো আজও তেমনি রয়েছে।

'পিনে এঁটে চিঠি রেখে যাওয়ার কথা তোমার মনে পড়ে?' প্রশ্ন করেই একটু হাসতে চেষ্টা করলাম।

ওর হাতটা তখন আমার হাতের সঙ্গে সংবদ্ধ। ও আমার হাতটাকে আরও একটু জোরে চেপে ধরে যেন একটু দম নিয়ে নিল। চোখ ফেটে আমার কান্না আসছিল। হঠাৎ ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। হাত দুটো ধরে ও আমাকে ওর বুকের কাছে টেনে নিল। ওর পাপড়ির মত নরম গালের ছোঁয়াচ তখন আমার ঠোঁটে এসে লেগেছে। প্রশ্ন হল—'এখনও সেদিনের কথা মনে পড়ে?··· মনে পড়ে?'···

হঠাৎ পিছনে সরে গিয়েই ও ওর কাঁধের ওপর থেকে সিল্কের ওড়নাটা ফেলে দিল। ওর মুখে চোখে তখন উত্তেজনার তুফান বয়ে চলেছে। প্রজাপতির পাখার মত হালকা ঠোঁট দুখানিতে সে কি মিষ্টি হাসি! ওর বুকের অনাবৃত অংশটুকু কামনায় রঙীন হয়ে উঠেছে। লজ্জায় ও আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকাল। সমস্ত শক্তি দিয়ে ও আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে। স্বপ্নাবিষ্টের মত উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, মনে পড়ে।'

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, এ বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধই যেন আমাদের নেই।

ওর চোখদুটো বেদনায় টলমল করছে। ওঃ, সে কি করুণ দৃষ্টি। বুকের সমস্ত বেদনা চোখ ফেটে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আমার হাতদুটো চেপে ধরতেই ওর ঠোঁট দুখানি একটু কেঁপে উঠল। আজের তৃপ্তি চিরদিন আমার স্মৃতিকে রঙীন করে রাখবে। জীবনে এমনিধারা

একটা মুহূর্তও এসেছিল—একথা ভাবতেও কত সুখ। স্মৃতি আছে, মানুষ তাই বেঁচে থাকে।

বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে ওর কথাগুলো শুনলাম। বুকে তখন আমার উত্তেজনার ঝড় তুলছে।

'নূতন বন্ধুর কাছ থেকে কিছুই কি পাও নি?' প্রশ্ন করেই একটু অপ্রতিভ হয়ে গেলাম।

উত্তর এল—'হ্যাঁ পেয়েছি, কিন্তু তৃপ্তি পাইনি। বেঁচে থাকার পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন সে আমায় শুধু তাই দিয়েছে। তার বেশী নয়। তার দানে শরীরের তৃপ্তি আছে, হৃদয়ের নেই। তুমি আমায় স্বর্গের আভাস দিয়েছ। মানুষের হৃদয় যা চায় তোমার কাছ থেকে আমি তাই পেয়েছি।' —আবেগের ধাক্কায় ওর শেষের কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে উঠল। চোখের জল চাপতে গিয়ে এবার সত্যি ও কেঁদে ফেলল।

ওর আনত চিবুক ধরে সান্ত্বনা দিলাম। আঙুলগুলোর ডগায় ভারি মিষ্টি একটা স্পর্শ লাগল।

'আগেও তোমাকে পেয়েছি কিন্তু তৃপ্তি পাইনি। আর দশ জনের মত তুমিও ছিলে সেদিন বিশেষত্বহীন কিন্তু আজ······আজ তোমার দৃষ্টিতে এক নূতন জীবনের আভাস পাচ্ছি। এই মুহূর্তে যে-কোন নারী তোমায় তার সব কিছু দিতে পারে।'

কথাগুলো মনটাকে ভারি চঞ্চল করে তুলল। ও চায় বুকভরা জীবন আর প্রেম। বেঁচে থাকার মধ্যে ওর তৃপ্তি হারিয়ে গেছে।

'সেদিনের ঝড়ের কথা মনে পড়ে?'—প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ পড়ে। বেশ স্পষ্ট করেই সেই ঝড়ের কথা মনে পড়ে। তোমার সেই বৃষ্টি-ভেজা হাতের গন্ধটুকু পর্যন্ত আজও আমার মনে পড়ে। আটই মে সেদিন। আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগের কথা।'

উত্তর দিলাম—'তিন বছর পর আবার সেই বসন্ত।' ও আমার কথাটার শুধু প্রতিধ্বনি করল। 'আজ থেকে আমাদের জীবনের নূতন যবনিকা উঠল।' কথাটা বলেই আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম।

কথার ধাক্কায় ওর মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল—আমার মুখের দিকে এমন করে তাকাল যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। দুহাত দিয়ে ও আমার দৃষ্টি থেকে ওর মুখটাকে আড়াল করতে চেষ্টা করল।

'তাকে সব বলে তোমায় চিঠি লিখে জানাব।'

উপর থেকে দরজা বন্ধ করার একটা শব্দ এল। ওর কথায় বেশ একটা দৃঢ়তার আভাস পেলাম। হঠাৎ আমার হাত দুটোকে ও আবার ওর হাতের মধ্যে টেনে নিল। ওর সারা দেহ তখন থর থর করে কাঁপছে। হাতের স্পর্শেই তা অনুমান করতে পারছি! দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ও ওর নরম আর রাঙা ঠোঁট দুটোকে আমার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল। ওর উঁচু আর কোমল বুকের স্পর্শে আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এক মুহূর্ত মাত্র।...দেহটাকে ছিনিয়ে নিয়ে ও ততক্ষণ সিঁড়িটার অনেক ওপরে উঠে গিয়েছে। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

'চিঠি লিখে সব জানাব।'—ওপর থেকে উত্তর এল।

বনের বুক ঘেঁষে নদীর ধারা বয়ে চলেছে। অনেকদিন ওর তীরে বসে কাটিয়েছি। গাছের গুঁড়িটা আজও ঠিক তেমনি আছে। ওর উপরে সেদিনও বসতাম। সন্ধ্যায় ও জায়গাটায় বসে থাকতে ভারি আরাম। নীচে নদীর ধারা বয়ে চলেছে। গাছের আড়ালে অনেকগুলো বাড়ী দেখা যায়। সূর্যের শেষ আলো ওদের জানালায় ঠিকরে পড়ে। এখান থেকে সবই দেখতে পাই। নদীর আঁকা বাঁকা গতিভঙ্গী ভারি সুন্দর।

আজও সেই চেনা পথের উপর দিয়েই চলেছি। মাথার উপরে পাইন গাছের শাখা দুলছে। কচিপাতার উৎসব তাদের এখনও শেষ হয়নি। একঝাঁক সূর্যকিরণ আমার মুখে এসে লাগল। বাঁদিকে ঘুরে নদীর ধার ঘেঁষে চলেছি। সামনেই গাছের সেই গুঁড়িটা। ওটা ঠিক একই রকম আছে—কোনই পরিবর্তন হয়নি।

মানুষের জীবন কি রহস্যময়! যতক্ষণ প্রাণে আনন্দ থাকে সব কিছুকেই সজীব মনে হয়। গুঁড়িটার উপর বসে পড়লাম। ওর একদিক থেকে খানিকটা বাকল ঝরে গেছে।

তিন বছর আগেকার কথা। সে এই গুঁড়িটার উপর বসত—আর আমার জায়গা ছিল পাশের ঐ সবুজ ঘাসের উপর। সেদিনও আজের মতই সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। চারদিক কুয়াসায় আবছা। ধীরে শান্ত নদী বয়ে চলেছে। ছোট ছোট ঢেউগুলো টলমল করে দুলছে। দু-একজন শ্রমিক আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। সে দিনগুলো আজও কত স্পষ্ট।

আর আজ?···আজ জীবনে কি মস্ত পরিবর্তন। সৌভাগ্য যখন হাতে এসে ধরা দেয় মানুষ নিঝুম হয়ে ঘুমায়। কিন্তু আবার দুদিন বাদেই আকাঙ্ক্ষার সে কি আকুতি! সেই একই পুরনো ঘটনার আবর্তন।

এমনি ধারাতেই জীবন বয়ে যায়। আশা আর আকাঙ্ক্ষা—বেদনা আর ক্রন্দন। আনন্দেও মানুষ কাঁদে। জীবনের কোন তৃপ্তি দিয়েই এ চোখের জলের পরিমাপ হয় না। তৃপ্তি পেতে হলেই দুঃখ সইতে হয়। চোখের সামনে এক একবার জীবন রসে উপচে ওঠে। উঃ জীবনের সে কি সুন্দর অভিব্যক্তি! সে আনন্দে মরুর বুকে সবুজ সাড়া দেয়—শুকনো শাখায় জাগে ফুলের স্বপন। যার জীবনে এমন মুহূর্ত আসে—সে ধন্য।

বিচিত্র জনস্রোত জীবনের পথে ছুটে চলেছে। কারও মাথায় জীবন-ধারণের উপকরণ···কেউ বা বিচিত্র বসনে সারা দেহ ভরে তুলেছে।

সবারই দৃষ্টিতে একই স্বপ্ন—কোনমতে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা। অমূল্য জীবনের বিনিময়ে মানুষ চায় বেঁচে থাকতে—শুধুই বেঁচে থাকতে। এই ত জীবন। বেঁচে থাকা—কেবলই কোন মতে বেঁচে থাকা।

সূর্য ডুবে গেল। ঢেউগুলো নদীর বুকে মৃদু মৃদু দুলছে। দু-একটা ছোট মাছ লাফিয়ে উঠে আবার ডুব মারছে। দূরের ঐ আবছা গ্রামটার পানে চেয়ে আছি। চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে।

কালই চিঠিখানা পাব—হ্যাঁ, ঠিক কালই। তারপর ?…তারপর আনন্দ, কেবল অফুরন্ত আনন্দ। এই গাছের গুঁড়িটা পর্যন্ত সে আনন্দে সজীব হয়ে উঠবে। এ জনহীন নির্জনতায় কাল আর কেউ নয়,—কেবল আমি আর সেই চিঠিটা। সারা আকাশ কান পেতে চিঠির ভাষা শুনবে।

চিঠি…। লম্বা আর শক্ত একটা খামের মধ্যে সেই চিঠিটা। বনের ধারে গাছের গুঁড়িটার উপর বসে আছি। কত স্বপ্ন চোখের সামনে দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। খামটা খুলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এমনি করে চিন্তা করতেও কি আরাম! হাতের মধ্যে এক অপূর্ব আনন্দের ছোঁয়াচ পাচ্ছি। গাছের গুঁড়িটার উপর খামটা নামিয়ে রাখলাম। ওকেও আমার এ আনন্দের ভাগ দিতে এসেছি। সামনে ছোট্ট নদীটা দুলছে। বাতাসে পাইনশাখার মর্মর ধ্বনি। সে লিখেছে :—

'প্রিয় বন্ধু, আমাদের মিলনের স্মৃতিকে স্মরণ করে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাই। সিঁড়ির পাশেকার সেই মধু.-লনের কথা আজও ভুলিনি। সমস্ত অতীত স্বপ্ন হয়ে সেদিন আমার বুকে জেগেছিল। জীবনে সত্যি এমন বুকভরা তৃপ্তি আর পাইনি। তোমার মধ্য দিয়ে আবার সেদিন

হারানো দিনের সন্ধান পেয়েছিলাম—যেদিন প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবাসতাম।

সবই মনে পড়ে। স্মৃতির দাগ বুক থেকে আজও মোছেনি! পাইন গাছের মধ্য দিয়ে সেই সেদিনের ফিরে-আসা—আকাশভরা সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার, ঝড়বৃষ্টি—সবই মনে পড়ে। সেদিনকার সেই চেরী ফুলের কথা ভুলিনি। চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে ভিজে হাওয়া ফুরফুর করে আমার চুলগুলোকে ওড়াচ্ছিল।

সবই মনে পড়ে। সেদিনের অতি নগণ্য ঘটনাটি পর্যন্ত। সেদিনের সেই ঝড়ের স্মৃতি মন থেকে কোন দিনই মুছবে না। সমস্ত আকাশভরা মেঘ—কালো আর বিশ্রী আর ভয়ংকর। চারদিকে বুঝি একটু হলুদেরও আমেজ ছিল। দৌড়ে এসে আমরা একটা ঘরে আশ্রয় নিলাম। ওরা যেন আমাদের তাড়া করে আসছিল। এমন ভয়ংকর মেঘ আমি আর দেখিনি। এত দুর্যোগেও ভারি ভাল লাগছিল। আমাদের মিলনকে মধুময় করতেই যেন সেদিনের ঝড়ের আবির্ভাব। ভয়ে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ভারি ভাল লাগছিল কিন্তু।

জানালা দিয়ে হাওয়া এসে তোমার গায়ে লাগছিল। বৃষ্টির ভিজে গন্ধের কথাও ভুলিনি। সেদিনের কথা মনে হলে আজও চোখে জল আসে। মাধুর্যের মধ্যে একটু বেদনার ছোঁয়াচ আছে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকি! চোখের পাতা জলে ভিজে ভারী হয়ে ওঠে। দু-এক ফোঁটা জল হাতের উপরেও গড়িয়ে পড়ে। কান্না চাপতে ইচ্ছা করে না।

এমনিধারা চোখের জলেও একটা আনন্দ পাই। আর কিছু দিয়েই এ আনন্দের পরিমাপ হয় না।…

ঠিক এমনিই হয়। মানুষের বুকে আনন্দের বান এমনি করেই আসে। ওঃ, সে কি আনন্দ; বুকভরা প্রাণভরা আনন্দ! কথার ছন্দে

গানের স্থর বেজে ওঠে। অফুরন্ত তৃপ্তির নেশায় মন মশগুল হয়ে ডুবে যায়।

অনেকে ভাবে আনন্দ কেবলই কল্পনার। কিন্তু না, তা নয়। এ আনন্দ বুকের আনন্দ—এ আনন্দে হৃদয়ের মধুময় প্রকাশ। ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এর চির-বিচ্ছেদ। ব্যষ্টির আনন্দে স্বার্থের বিকাশ, কিন্তু এ যে শাশ্বত।

চোখের জলে অভিষিক্ত এক একটা স্থর যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে। সবই নির্ভর করে নিজের উপর; নিতান্তই নিজের মূল্যের উপর।

মনে পড়ে? বন্ধু, তোমারও মনে পড়ে? ঘরের মধ্যে সেই আধ-অন্ধকারের কথা—টেবিলের উপর সেই বুনোফুলের গন্ধ? নিশ্চয়ই মনে পড়বে। এমন কথা জীবনে সবারই মনে পড়ে। ঘরভরা বৃষ্টি আর ভিজা ঘাসের গন্ধ।···

সে এক ছুটির দিন। সেই কখন ঘর ছেড়ে বের হয়েছি। খাবারের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ছোট্ট এক টুকরা খাবার ভাগ করে খেয়েও সে কি তৃপ্তি!

সেদিন কোন্ পোশাকটা পরেছিলাম সে কথাটা পর্যন্ত মনে আছে। সাদার উপর লাইলাক ফুলের কাজ-করা একটা পোশাক। নয়?··· তোমাকে কাছে পেতে মন কখন আমার উন্মুখ হয়েছিল জান? সেই যখন আমরা ঘরে ফিরে এলাম। বাইরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে। কি যেন একটা বুনো ফুলের গন্ধে ঘর ভরা।

তারপর···তারপর এল একটা পরিসমাপ্তি। তুমি আসতেই আমি দরজা খুলে দাঁড়ালাম। আমায় বুকে চেপে তুমি ঘরের মধ্যে ছুটে গেলে। তোমার বাহুর নিবিড় বন্ধনে সেদিন সত্যি আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর?—আর নয়···

তুমি নীরবে আমার পাশে বসেছিলে। তোমায় দেখে মনে হচ্ছিল যেন অনিচ্ছায় কোন কর্তব্যের সামনে দাঁড়িয়েছ।

এমনিই হয়। অমূল্য সম্পদ যখন কাছে ধরা দেয় তখন তার মূল্য এমনি করেই যায় বিকিয়ে। বুকের ছন্দে গান এলে সুরকে ফেলে হারিয়ে।

এক একজন মানুষ কিন্তু আকাঙ্ক্ষার সফলতায়ও তার ছন্দ হারায় না। যুগ যুগ ধরে এরা মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকে। কিন্তু এদের সংখ্যা খুবই কম।

হৃদয়ের এই দারিদ্র্য সত্যই বড় করুণ।……

তুমি চলে গেলে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াতাম। নিজের মুখের দিকে নিজেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম। কত শরৎ-সন্ধ্যা তোমার প্রতীক্ষায় কেটে গেছে। সারা দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কথা মনেই পড়ত না।

বসে বসে এক এক সময় ভারি বিরক্ত লাগত। ঘর ভরে পায়চারি করতাম। বুক ভেঙে এক একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত।

নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতাম। আরও কত রাত এমনি একলা কাটবে? প্রতীক্ষার কি অবসান হবে না কোন দিনই? নিঃসঙ্গ জীবনের সে কি বেদনা!

এক এক সময় বেঁচে থাকার চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠতাম, সব আনন্দের কথা ভুলে যেতাম। আমাকে বাঁচিয়ে রাখার মত মানুষ কি একজনও নেই? আর কিছুই নয়—কেবলই শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে আমি একজনকে চাই। তার কাছ থেকে হৃদয় আমার হয়ত তৃপ্তি পাবে না। তা নাই বা পাক্।

শেষে একদিন সত্যি একজন বন্ধুকে পেলাম। কেমন করে পেলাম জিজ্ঞাসা করো না। তার আলিঙ্গনে বুক ভেঙে আমার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে

আসত। সে জানতেও পারেনি কোন দিন কোথায় আমার দারিদ্র্য। তার আলিঙ্গনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি—একটুও আপত্তি করিনি। আমার দেহ নিয়েই সে তৃপ্ত।

সেদিন তোমায় দেখে কতখানি ভালবেসেছিলাম তোমায় আর তা বলব না। তোমার দৃষ্টিতে সে কি ব্যাকুলতা! কেবল ব্যাকুলতা নয়, প্রেমও। আমার সমস্ত প্রাণ সে দৃষ্টির কাছে নত হয়ে গেছে। সেদিন সত্যি তোমার পানে প্রাণ আমার উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।

মানুষের জীবনে আনন্দ আসে, কিন্তু খুবই ক্ষণিকের জন্য। তারপর ব্যথা আর বেদনা, প্রতীক্ষার অশ্রু। সুন্দরের প্রতীক্ষায় হৃদয়ের সে কি আকুতি! আনন্দ কারো ভাগ্যে চিরস্থায়ী নয়।

মনকে প্রশ্ন করেছি—'জীবনের পথে যাকে চাই? দুর্লভ আনন্দ যে দিল তাকে, না যাকে আশ্রয় করে চলবে নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা, তাকে? কেবল প্রশ্নই করিনি, সমাধানও করেছি।'…

হঠাৎ বুক ভরে কান্না উথলে উঠল। ঝাপসা চোখে চিঠিখানার কিছুই দেখছিলাম না। আঙুলের ডগাগুলো পর্যন্ত আমার সাদা হয়ে উঠেছে। গাছের গুঁড়িটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। নিজেকে যেন স্থির রাখতে পারলাম না। কোনমতে চিঠিখানা শেষ করলাম। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল…

'বন্ধু! শেষপর্যন্ত নিশ্চিন্ততাকেই বেছে নিলাম। বেঁচে থাকা আমার নিতান্তই প্রয়োজন।

সেদিন তোমায় যে চুম্বন দিয়েছিলাম সেই আমার শেষ চুম্বন। বুনো-ফুলের গন্ধে ভরা ঝড়ের মধ্যে যে জীবনের সূত্রপাত ঐ চুম্বনের মধ্যেই ছিল তার সমাপ্তি।'

এইটুকু ত ঘটনা।

স্টোভের আগুন নিভে গেছে। ঘর ভরে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল। বাইরে ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপি শুনছি। জানালার গায়ে বৃষ্টি-ঝরার শব্দ। কেউ যেন হাত দিয়ে জল ছিটিয়ে যাচ্ছে ওখানে। দম নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ এখন আরাম পাচ্ছি। হাতের উপর গরম কি যেন ঝরে পড়ল। নিভন্ত স্টোভটার দিকে চেয়ে আছি। জামায় হাতটা মুছে নিলাম। তারপর…? খুবই সামান্য ঘটনা—যেমন চিরদিন হয় এও তেমনি স্বাভাবিক।

বিশ্বস্ততা

অতি সাধারণ একটা ডুপারম্যান টেরিয়ার কুকুর—কালো রঙ, কিন্তু বুকটায় হলুদ, থাবাগুলোতে হলুদ রঙের ছোপ, চোখের চারদিক ঘিরেও দুটো ছোট্ট হলুদ রঙের বৃত্তরেখা। কুকুরটার লেজের মাথা ছাঁটা—সাধারণতঃ যেমন হওয়া উচিত।

সব সময়ই চঞ্চল সে। কোন না কোন কাজ তার চাইই চাই। সবল লম্বা পাগুলোর উপর সোজা দাঁড়িয়ে লোভী দৃষ্টি মেলে সে তার পালিকার চোখের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে কোন কাজ পাবার প্রত্যাশায়। বাড়ীর বাইরে বেরোলেই তার কাজ, ছুঁড়ে-ফেলা একটা ছড়ির পিছনে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে গিয়ে সেটিকে দাঁতে কামড়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

এই সব-সময় ছুড়ে-দেওয়া ছড়িটার পিছনে ঠিক পাগলের মতো ছুটে যায় সে,—সেটাকে কামড়িয়ে ধরে ফিরিয়ে এনে পালিকার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে। তারপর প্রভুর চোখের দিকে অধিকতর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে ব্যাপারটার অনুবৃত্তির অপেক্ষায়।

খবরের কাগজে জড়ানো কেনা জিনিস-পত্র বয়ে শহর থেকে সব সময়ই সে পালিকার আগে আগে পথ চলে। আর মাঝে মাঝে খবরের কাগজের উপর দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখে তার পালিকা ঠিক আসছে কি না।

মহিলাটির বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। শীতের সময় একটা ধূসর রঙের স্কুইরেল কোট পরে সে। টুপিটাও তার ঠিক ঐ একই রকম ফারের তৈরী। ঘরে ফিরে কোট আর টুপি খুলে রাখলেই তার গায়ে কনুই পর্য্যন্ত নামানো একটা কালো পোশাক দেখতে পাবে। হাতে ঝুমকা দোলানো একটা চেন ব্রেসলেট। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অগোছাল চুলগুলোকে ঠিক করতে করতে বড় বড় চোখ দুটোর বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে অনেকক্ষণ ধরে সে নিজের পাতলা মুখখানিকে নিবিষ্টভাবে চেয়ে দেখে। কুয়াসায় ঢাকা বাতাসের মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে গাল দুটো শিটিয়ে উঠলে যেমন করে কেউ মুখের উপর দিয়ে হাতটাকে বুলিয়ে নেয়, সেও ঠিক তেমনি ভাবেই মুখের উপর দিয়ে হাতটাকে বুলিয়ে নিয়ে যায়। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে তার টাইপরাইটারটার সামনে গিয়ে বসে।

হাতে টাইপ করার কাজ থাকলে কুকুরটার দিকে সে চেয়ে প্রশ্ন করে, 'আজ কি করবিরে টম?'

এতক্ষণ ধরে পালিকার প্রত্যেকটি ভঙ্গী সে লক্ষ্য করছিল। প্রশ্ন হতেই পাগুলোর উপর সোজা দাঁড়িয়ে মেঝে থেকে হঠাৎ সে উপরের দিকে

লাফিয়ে ওঠে পালিকার মুখটাকে চাটবে বলে। তারপর ঐ কোণের কম্বলটার উপর দাঁড়ানো আরাম কেদারাটার দিকে ছুটে এগিয়ে যায়! প্রভুকে আদর করতে আহ্বান করার এই হ'ল তার রীতি।

ঐ আরাম কেদারায় বসে বই পড়তে পড়তে কিংবা সেলাইয়ের কাজ হাতে নিয়ে প্রায়ই সে কুকুরটার সঙ্গে গল্প জমায়। টমের কাছে অবসর-বিনোদনের পক্ষে এইটাই হ'ল সব চেয়ে আরামের কাজ।

কুকুরটার বুদ্ধির কথা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হয়ে যেতে হয়! মহিলাটির প্রায় প্রত্যেকটি কথা সে বেশ বুঝতে পারে। ঐ উল্টো দিকের কম্বলটার উপরে বসে বসে সে তার প্রত্যেকটি গতি আর কথা উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ্য করে। কখনও হয়ত অপ্রত্যাশিতভাবে পালিকার কোলের উপরে থাবাটাকে তুলে দেয়।

কোন সময় মহিলাটি হয়ত একটা হাত কুকুরটার খাটো আর নরম ঘাড়ের উপর এলিয়ে দিয়ে মুখে রুমাল চেপে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে কুয়াসায় ঝাপসা জানালাটার কাচের দিকে। চিন্তা তার কোন সুদূরে পাড়ি জমায় কে জানে? টম যেমন ছিল তেমনি নীরবেই পড়ে থাকে, একটুও নড়ে না, পাছে ঘাড়ের উপর থেকে পালিকার হাতের নরম আর উষ্ণ স্পর্শটুকু সে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু চোখ দুটো তার তখনও চঞ্চল। এরই মধ্যে ব্যস্তভাবে উপরের দিকে চেয়ে সে অনেকবার তার প্রভুকে লক্ষ্য করেছে।

'আচ্ছা টম, সত্যি আজও কেন আমি বেঁচে আছি বলতে পারিস? মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে না পড়া পর্যন্ত শুধু কাজ করতে? ক্ষুধা নেই তবু খাচ্ছি,—ভাল করে ঘুমুতে পারি না তবু সব কিছুই আবার নূতন করে আরম্ভ করতে হয়। শুধু এর জন্যই কি? শুধু এর জন্যই বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয়?'

কথাগুলো শুনেই টম ভয়ানক চঞ্চল হয়ে ওঠে। কম্বলের উপরে যেখানটায় বসেছিল সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে পালিকার বিষণ্ণ চোখের দিকে দৃষ্টি মেলে আবার শুয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তার চোখের কোলে ঘনিয়ে ওঠে বিষাদের ছায়া।

কুকুর হলেও মানুষের চেয়ে অনেক বড় অনেক মহৎ তোরা। মহিলাটি বলে যায়—'তোরা এত বিশ্বস্ত, এত বেশী ভালবাসতে জানিস্‌ যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এখন কেবল তুই আর আমি আছি; সে আমাদের ত্যাগ করেছে।'...

টম চঞ্চলভাবে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে কিসের যেন গন্ধ নেয়। তারপর আবার কম্বলটার উপর নিজের জায়গায় ফিরে এসে কথায় মনোনিবেশ করে। চোখ দুটো কিন্তু তখনও সে পালিকার দিক থেকে সরাতে পারে না।

'এই দুর্দিনে যার কাছে তুই হৃদয় বিলিয়ে দিলি সে যখন তোকে পরিত্যাগ করে চলে যায় তখন তার অর্থ কি হয় জানিস্‌? যা ঘটেছে তার পরেও জগতে একলা জীবন কাটানোর অর্থ বুঝিস্‌ কিছু? এই দেয়ালগুলোর অন্তরালে বসে বসে নিজের অপ্রয়োজনীয় অস্তিত্বটাকে কোন রকমে টেনে চলা—এর কোন মানে হয় কি টম?'

টম এমনভাবে মাথাটা নোয়ায় যে, যা ঘটেছে তার জন্য যেন সে নিজেই অপরাধী। মাঝে মাঝে ভ্রূর নীচ দিয়ে পালিকার দিকে চেয়ে তখনই আবার সে চোখ দুটোকে নামিয়ে নেয়। এমন নির্দয়ভাবে যে আহত তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা'ও যেন সে সহ্য করতে পারে না। তারপর কম্বলটার উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে পালিকার কাছে এসে সে তার হাতটাকে চাটতে শুরু করে।

'এর আরম্ভ কেমন করে হলো তোর মনে আছে? তখন আমরা

আর একটা বাসায় থাকতাম। এপ্রিলের শেষাশেষি। বার্চ গাছের ডালে ডালে সবেমাত্র ফুলের মরসুম শুরু হয়েছে। শীতের পর সেই প্রথম ব্যালকনির দরজাটা খুললাম। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। গাছের মাথায় মাথায় ফড়িংগুলো ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত আমরা তার সঙ্গে ব্যালকনির উপরেই দাঁড়িয়ে থাকতাম। সেই গেছে আমাদের সব চেয়ে উজ্জ্বল আর সুখের মুহূর্ত। সেই মুহূর্ত আর জীবনে ফিরে এল না। মানুষ হয়েও তোদের চেয়ে আমরা কত কম ভাগ্যবান বুঝতে পারিস্? তোর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। আমার উপর থেকে তোর ভালবাসা আজ পর্যন্তও একটু বদলায়নি'······

টম ঘেউ ঘেউ করে লাফিয়ে উঠে পালিকার মুখটাকে চাটতে শুরু করে।

'যখনই তোর মাথার উপর হাতটা রাখি, আনন্দ আর তোর ধরে না। কিন্তু আমাদের উচ্ছ্বাস দুদিনেই নিভে যায়—বিশেষ করে পুরুষদের। তারপর আমরা মেয়েরা বুকভরা একাকীত্বের বেদনা বয়ে, আহত হৃদয়ে,—তোর কাছ থেকে যে ভালবাসা পেয়েছি ঠিক তেমনি ভালবাসা আর বিশ্বস্ততার পথ চেয়ে বসে থাকি। কিন্তু এই ভালবাসা আর বিশ্বস্ততা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে দুর্লভ···। তাদের কাছে এর কোন প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। বোধহয়, তোর বেশ মনে আছে, যখন আমার কাছে ঘেঁষাও তার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, এমন কি আমার হাতটাতে পর্যন্ত ঠোঁট ছোঁয়াবার অনুমতিও তাকে দেইনি,—তখন কি অনুরাগই না ছিল তার আমার উপর। তোর মতো সেও সেদিন আমার চোখের দিকে এমনি করেই তাকিয়ে থাকতো। তখন নিজেকে বোঝাতাম আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনের অবসান হল বুঝি। আমার এই জীবনটায় কারো প্রয়োজন আছে,—কেউ সব সময়েই আমার কথা ভাবছে,—আমার জন্য অপেক্ষা করছে,—এই চিন্তা যে মানুষকে কতখানি আনন্দ দিতে পারে, তা বোধ হয় তুই বুঝতে পারবিনে টম।'

কম্বলের উপর মাথাটাকে একপাশে কাত করে, একটা কান উপরের দিকে খাড়া রেখে,—মুখের উপর দুটো চোখের দৃষ্টি মেলে দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে টম উৎকর্ণ হয়ে মহিলার কথাগুলো শুনে যায়।

'জীবনের সবচেয়ে দুর্দিনেও পাশে এসে দাঁড়াবে,—শেষ পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গেই চলবে, জগতে এমন একটি প্রাণীও আছে, এই কথাটা নিশ্চিতরূপে জানা—এর চেয়ে বড় আনন্দ বুঝি আর নেই। খুব বেশী না হলেও তুই বোধ হয় বুঝতে পারিস্ এর অর্থ খানিকটা। কেমন ঠিক বলেছি কি না?'

বুঝতে পেরেছে এমনিভাব দেখিয়ে টম পালিকার হাঁটুর উপর থাবাটা তুলে দেয়।

'এমনি ধরনের আনন্দে আমিও বিশ্বাস করতাম, কিন্তু কতদিন? যতদিন আমি ছিলাম নাগালের বাইরে, সে আমার পাশেও আসতে অনুমতি পায় নি। এপ্রিলের সেই সন্ধ্যায়,—বসন্তের আতপ্ত আবছা আলোয় উন্মুক্ত ব্যাল্‌কনির দরজার কথা আজও আমার মনে পড়ে। এমনি একটা মদির সন্ধ্যায় কোন তরুণীর সান্নিধ্য যে পুরুষের কাছে একটা উত্তেজনার ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই—বিশেষ করে মেয়েটি যদি সুন্দরী আর দুষ্প্রাপ্য হয়। প্রথমে যে মেয়েটির কাছে ঘেঁষাও ছিল দুঃসাধ্য সেই তরুণীই যখন তার সামনে ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ে—তারপর এক মুহূর্তের বিস্মৃতিতে হাতটাকে বাড়িয়ে দিয়ে আবার তখনই সসংকোচে পিছনে টেনে নেয়,—তার গালের রঙ কামনায় অধিকতর রঙীন হয়ে ওঠে, আবছা অন্ধকারে চোখ দুটোতে নেমে আসে অপূর্ব ঔজ্জ্বল্য তখন সেই দৃশ্য উপভোগ করার চেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার পুরুষের কাছে আর কি হতে পারে? এই সব কিছু মিলেই পুরুষের কামনাকে উত্তেজিত করে তোলে।'

তারপর এক সন্ধ্যায় দুর্লভ যখন হাতে ধরা দেয়—অস্বাভাবিক হয়ে আসে নিতান্তই সাধারণ তখনই বুঝতে পারি আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে

পরিবর্তন নেমে আসছে। যে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আশা ও আনন্দের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল তারই চোখে তখন আমি হয়ে উঠি তেমনি ধরনের একটি মেয়ে দুদিনের চেষ্টাতেই যাকে বশে আনা যায়। তখন বুঝতে পারি পুরুষের যতকিছু আকর্ষণ তা কেবল ঐ বাধাটুকুকে জয় করবার জন্যই।

'আজ বেশ মনে পড়ে এত বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তোর উপর কি অন্যায় ব্যবহারটাই না আমি করেছি।'

বেদনায় ককিয়ে উঠে টম প্রভুর সুগোল হাঁটুটার উপর মাথাটাকে নামিয়ে রাখে। চোখ দুটো তখনও তার পালিকার মুখের দিকে আবদ্ধ।

'আমি তোকে অনেক রকমে অবহেলা করেছি। অতিরিক্ত ভালবাসিস বলেই সব সময়ই আমার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিস তুই কিন্তু তাতে আমি বিরক্তই হয়েছি মাত্র। নিজের নির্বুদ্ধিতায় তোর ভালবাসার মূল্য দিতে পারিনি আমি। মানুষের ভালবাসায় বিশ্বাস ক'রে পশুর অনন্ত ভালবাসাকে আমি অপমান করেছি।

'তারপর স্বাভাবিক যা তাই ঘটল। আমার উপর থেকে তার আকর্ষণ ক্রমেই শিথিল হয়ে আসতে শুরু করল। আমার কাছে খুব বেশী তখন আর সে আসতো না। একটা কিছু না কিছু কাজের অজুহাত তার থাকতই। তখন দেখতাম কি নির্যাতনই না ভোগ করেছিস তুই আমার জন্য। তোর এই বুদ্ধিদীপ্ত চোখ তুলে আমার দিকে দূর থেকে তাকিয়ে তুই করুণভাবে আশে পাশে ঘুরে বেড়াতিস্। প্রায়ই দেখতাম আমার বিছানার পায়ের দিকে তোর অভ্যস্ত জায়গাটায় শরীরটাকে সংকুচিত ক'রে,—থাবার উপর মাথা রেখে তুই নীরবে শুয়ে আছিস একা একা। তোর চোখ দেখে মনে হতো প্রকাশ্যে না হলেও সব সময়ই তুই আমাকে লক্ষ্য করছিস্।

'যখনই ঘর ছেড়ে বের হতে যেতাম,—কিসের যেন আশঙ্কায় তুই তোর মাথাটা তুলতিস কিন্তু ওঠবার সাহস হতো না তোর। কিন্তু তোর চোখ

জুটোর করুণ আর ক্ষুধিত দৃষ্টি আমার অনুসরণ করত। আমি সবই লক্ষ্য করতাম বন্ধু; কিন্তু লক্ষ্য করেও তাতে শুধু বিরক্তই হয়েছি তখন।

'একটি মেয়ে যে কতখানি অপমানে ডুবতে পারে'—মহিলাটি বলে যায়—'উঃ কি নিদারুণ সে অপমান……!'

টম কোনদিনই তার এমনিভাবে হাতে মুখ ঢাকা কিংবা এমন করুণভাবে কথা বলা সহ্য করতে পারে না। তাই হতভম্বের মতো ককিয়ে আর্তনাদ ক'রে সে চেয়ারটার উপর লাফিয়ে উঠে আদর ক'রে পালিকার হাত আর মুখ চাটতে শুরু করে দেয়। কিন্তু তখনই আবার কি যেন মনে ক'রে, ভয়ে ভয়ে মেঝের উপর নেমে কম্বলটার উপর মাথা পিছনে দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ে। তারপর দাঁত দিয়ে একটা মাছিকে কামড়ে ধরতে ভয়ংকর রকম ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মাছি ধরার পালা শেষ হতেই একটু নড়েচড়ে, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সে আবার আগের অবস্থাতেই স্থির হয়ে শুয়ে থাকে।

'আমার এই হাতটার উপর তোর চাবুকটা দিয়ে সে যেদিন আমায় মারল সেদিনটার কথা তোর মনে আছে?' মহিলা বলতে শুরু করল—'কনুই পর্যন্ত একটা দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। এর পরেও আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম তোর মনে আছে—মনে আছে টম?'

ঠিক যেন মনে নেই এমনি ভাব করে টম মাথাটাকে একপাশে কাত করে আবার অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়। তার ভাব দেখে মনে হয় যেন সময়টার কথা ভুলে যাওয়ায় পালিকার কাছ থেকে তা নিশ্চিতভাবে জেনে নেওয়ার জন্য সে অপেক্ষা করছে।

'চাবুকটা কড়িয়ে নিয়ে তার হাতে দিয়ে বললাম,—মারতে চাও, যত খুশি তুমি আমায় মারো কিন্তু আমায় ত্যাগ করো না—ছেড়ে যেওনা… এমনি ভালবাসা কেবল তোদের মতো কুকুরদের মধ্যেই সম্ভব। তুই এর

অর্থ খুব ভাল বুঝবি, কিন্তু মানুষ···তাদের কাছে কোন মূল্যই নেই এর। তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারাও তোর মতো ভালবাসতে পারে না। সে যখন আমায় ছেড়ে চলে গেল,—তখন নিজেকে বোঝালাম মানুষের কাছ থেকে কেউ যেন কিছু প্রত্যাশা না করে। নিঃসঙ্গ জীবনকে বরং গর্বের সঙ্গে বরণ করা ভাল, তবু মানুষকে কাছে ঘেঁষ্‌তে দিতে নেই। সব মানুষই স্বার্থপর আর বিশ্বাসঘাতক—তারা কেবল চায় ভোগের আনন্দ আর উত্তেজনা।

'চিরদিন যা ঘটেছে আমার এই কাহিনী ঠিক তেমনি মামুলি গল্প। উঃ! শেষ পর্যন্ত নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া যে কি পীড়াদায়ক তা তোকে কেমন করে বোঝাবো টম। এ ব্যাপারে বিশ্বস্ততাই হল মেয়েদের সমস্ত জীবনের কেন্দ্র। আমরা প্রত্যেকেই,—সত্যি করে যার মধ্যে মানুষের প্রাণ আছে—দীর্ঘ রজনী ভরে নীরবে এই বিশ্বস্ততার স্বপ্ন দেখি।

'তারপর তোর কথা মনে পড়ল। তখন নিজেকে বললাম,—টম অন্ততঃ আমায় কোন দিন প্রতারণা করবে না, শেষ নিঃশ্বাসটুকুও হয়ত আমার জন্যই ব্যয় করবে—আমার শত্রুর টুঁটি কামড়ে তাকে নিঃশেষ করতে চেষ্টা করবে, আর তা নয় তো শেষ পর্যন্ত আমার জন্যই প্রাণ বিলিয়ে দেবে।'

পালিকার মুখের সামনে টম আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে। তারপর গর্জাতে গর্জাতে দরজাটা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে আবার নিজের কম্বলটার উপরে এসে বসে পড়ে। তার ভাব দেখে মনে হয় যেন পালিকার ইঙ্গিত পেলেই সে যে কোন লোককে লাফিয়ে গিয়ে আক্রমণ করবে।

'বিশ্বাসী বন্ধু আমার, আয় আমরা চিরজীবনের জন্য প্রতিজ্ঞা করি, মৃত্যুর আগে কেউ কাউকে পরিত্যাগ করব না। কেমন মত আছে? দে তোর থাবাটা আমার হাতে তুলে দে—সঙ্গে সঙ্গে তোর স্বীকৃতিও।' পালিকার প্রসারিত হাতখানার উপর টম আনন্দে তার থাবাটা তুলে দেয়।

শীত শেষ হয় হয়। পথের এখানে ওখানে নোংরা আর ধূসর কাদা জমে আছে। যে সব জায়গাগুলোতে সূর্যের আলো বেশী সেখান থেকে এরই মধ্যে বরফ গলে শেষ হয়ে গেছে। ছাদ থেকে বড় বড় জলের ফোঁটা টিপ টিপ করে মেঝের উপর ঝরে পড়ে। অস্ত সূর্যের রাঙা আভা অনেক-ক্ষণ পর্যন্ত দিগন্তের কিনারায় জড়িয়ে থাকে। শান্ত আকাশের বুকে পপ্লার আর লাইম গাছের মাথাগুলোকে স্পষ্ট মনে হয়। তাদের ডালে ডালে এখনও পাতার সমারোহ আরম্ভ হয়নি।

শীতের সময় সূর্যের আলো ঘরে ঢুকতে পারত না। কিন্তু এখন ফ্রেমের কোণায়—দরজার সাদা চৌকাঠের উপর অস্তগামী সূর্যের অপেক্ষমাণ লাল আলো ঝলমল করে। সমগ্র প্রকৃতির বুকভরা প্রশান্তি আর বসন্তের সৌম্য শান্ত নির্জনতা।

টমের পালিকা প্রায়ই এখন আপন মনে বসে পিয়ানো বাজায়। তার ঘন নিবিড় কেশের অরণ্যে অথবা ব্রঞ্জের ক্যাণ্ডেল স্টিকটার উপর সূর্যাস্তের শেষ আভা ধীরে ধীরে নিভে আসে। সুরের করুণ মাধুর্য সমস্ত ঘরটাকে কানায় কানায় ভরে তোলে।

টমের কিন্তু গান মোটেই ভাল লাগে না। গান শুনলেই সে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ইচ্ছা না থাকলেও তার এমন শব্দ করতে ইচ্ছা করে যা মানুষের কাছে নিতান্তই বিরক্তিকর—বিশেষ করে তার পালিকার কাছে। সুতরাং প্রসারিত থাবার উপর মাথাটা নামিয়ে রেখে বহু কষ্টে সে নিজের ইচ্ছা দমন করে। আর মাঝে মাঝেই চোখ তুলে পালিকার দিকে চেয়ে দেখে।

একদিন মহিলাটি খুব উল্লসিত ভাবে বাড়ী ফিরে এল। তাকে দেখেই টম ছুটে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল। টুপিটা খুলে রেখেই অস্বাভাবিক নিবিড়তায় সে টমকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার মধ্যে যে উদ্দাম আনন্দের ঝড় তুলছিল—এই আদর তারই বহিঃপ্রকাশ।

সে হঠাৎ অসম্ভব রকম সুন্দরী হয়ে উঠেছে। তার পাতলা পাংশু মুখে লেগেছে সজীবতার রঙ—চোখ দুটোতে ঝলমল করে ঔজ্জ্বল্য। চুলগুলো গুচ্ছে গুচ্ছে গালের উপর দিয়ে লতিয়ে নামায় তাকে অনিন্দ্যসুন্দরী বলেই মনে হচ্ছিল। তার উপর বয়সও যেন তার অনেকখানি কমে গেছে। এক কথায় সে তখন নিখুঁত সুন্দরী তরুণী। কোমলতার বন্যা তার সারা শরীরটাকেই লীলায়িত করে তুলেছে। শরীরের প্রত্যেকটি রেখা আর ছন্দে আনন্দ চলকে বেরিয়ে আসতে চায়।

এখন থেকে প্রত্যেক সন্ধ্যায় দেরাজ খুলে সে তার সব চেয়ে দামী সিল্কের মোজাজোড়া বের করে পরে। আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার টুপিটাকে ঠিক করে নেয়—ইচ্ছা ক'রেই তার সোনালী চুলগুলোর কয়েকটি গুচ্ছকে টুপির নীচ থেকে কোটের কলারের উপর দিয়ে ঘাড়ের উপরে লতিয়ে নামতে দেয়।

আজ কাল বাড়ী থেকে বের হয় সে একা একাই। কিন্তু বেরোবার আগে অনেকক্ষণ ধরে সে টমকে আদর করে—তার উপর যাতে সে অভিমান না করে সে জন্য আর একটু ধৈর্য ধরে থাকতে তাকে অনুরোধ করে যায়। বিছানার পায়ের দিকে টম তার নিজের জায়গায় মনমরা হয়ে শুয়ে থাকে,—গভীর নিঃশ্বাস ফেলে,—থাবার উপর মাথাটাকে নামিয়ে রাখে। পালিকা না ফেরা পর্যন্ত এমনি ভাবে অপেক্ষা করেই তার সময় কাটে।

একদিন হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে টম দরজার দিকে ছুটে গেল—কোন অপরিচিত লোকের গন্ধ পেয়েছে সে। দরজা খুলে তার পালিকা এসে ঘরে ঢুকল—পিছনে কে একজন অপরিচিত লোক। লোকটার গায়ে কোট—মাথায় ধূসর রঙের টুপি—গলায় একটা মাফলার জড়ান। প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে অপরিচিত লোকটির দিকে তাকিয়ে টম রুদ্ধরোষে গর্জাতে লাগল।

'এ আমাদের একজন বন্ধু। একে এমনি করতে নেই বুঝলি টম?' নবাগতের দিকে ফিরে মহিলাটি বলল—'ওর গায় হাত দিয়ে আদর করুন, দেখবেন আপনাকে চিনে ফেলবে দুদিনেই। তখন আর আপনাকে অপছন্দ হবে না ওর।'

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও লোকটি টমের ফোলানো ঘাড়ের উপর হাত রেখে একটু আদর করল! টম ধীরে ধীরে মাথাটা নামিয়ে নিল বটে কিন্তু অভ্যর্থনার কোন লক্ষণই দেখাল না। পালিকার ইচ্ছার কাছে নির্বিবাদে কেবল নিজেকে বিলিয়ে দিল সে।

তারা সোফায় বসে যখন গল্প করছিল, মহিলাটি টমকে ডেকে নিয়ে খুব আদর করল—তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। তারপর সেই লোকটির কাছে তার অসাধারণ বুদ্ধি আর বিশ্বস্ততার গল্প বলতে লাগল।

এপ্রিল শেষ হয় হয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠতেই শহরের কোলাহল ক্রমশঃ মিলিয়ে আসে। আকাশের গভীর রঙ আরও পরিষ্কার আর অনাবিল হয়ে ওঠে। ফুলন্ত বার্চ গাছের মাথায় মাথায় প্রজাপতির আনাগোনা। রাত্রি ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত ব্যালকনির উপরেই বেশ সময় কাটে।

সেই লোকটি প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যায়ই সেখানে আসে। পালিকার হাঁটুর উপর মাথা রাখতে গেলেই সে এখন প্রায়ই বিরক্তিতে টমকে ঠেলে সরিয়ে দেয়, পোশাকটাকে ঝেড়ে ঠিক করে—লোম লাগিয়ে দিয়ে টম যেন পোশাকটাকে নোংরা করে দিয়েছে!

প্রথমটায় তাদের আলাপ ছিল নিতান্তই মামুলি—প্রতিদিনের চেনা লোকের সঙ্গে মানুষ যেমনভাবে সাধারণতঃ কথা বলে। লোকটি জানালার পাশে চেয়ার টেনে এসে বসত—আর মহিলাটি বসত একটু দূরে একটা আরাম কেদারায়।

কদিন যেতেই তাদের আলাপের ধরন বদলে গেল। দুজনের কণ্ঠেই

নামল অপূর্ব কোমলতা। এখন আর লোকটি চেয়ারে বসে না—সোফার উপরে এসে বসে পড়ে। মেয়েটি অবশ্য এখনও ঐ আরাম কেদারাতেই বসে থাকে কেননা একসঙ্গে পাশাপাশি বসবার সাহস সে তখন পর্যন্ত অর্জন করে উঠতে পারেনি।

লোকটির কথা শুনতে শুনতে এখন প্রায়ই তার গাল দুটো রাঙা হয়ে ওঠে—মাথার দু-এক গাছা চুল এদিক-ওদিক এলোমেলোভাবে উড়তে থাকে। উত্তেজনা চেপে রাখবার প্রচেষ্টায় মাঝে মাঝেই তার চোখ দুটো ঝিলমিল করে জ্বলে।

লোকটি চলে যেতেই সে প্রায়ই দুহাতে মুখ ঢেকে নিজের বিছানায় বালিশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব্যালকনির দরজার সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকে···।

এক সন্ধ্যায় তারা দুজনে একসঙ্গে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকার ঘন না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কোন কিছু থেকে নিজেকে আড়াল করবার জন্যই যেন মহিলাটি দৌড়ে এসে হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ল। আধ-অন্ধকারে পর্দার সামনে থেমে আঙুলের ডগা দিয়ে সে তার কপালের দুটো দিক খুব শক্ত করে চেপে ধরল। লোকটাও পিছনে পিছনে তার অনুসরণ করল। তাকে না দেখে বিস্মিতভাবে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে তার নাম ধরে ডাকল। তারপর হঠাৎ মেয়েটির উপর চোখ পড়তেই সে হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিল। মেয়েটির সারা শরীর তখন থর থর করে কাঁপছিল। কোনরকম বাধা না দিয়ে সে তার মাথাটাকে নীরবে লোকটার কাঁধের উপর নেতিয়ে দিল।

টম গর্জাতে গর্জাতে পালিকার সাহায্যের জন্য ছুটে এল। কিন্তু খুব

বিরক্তভাবে মেয়েটি তাকে দূরে সরিয়ে দিল। এমনি ব্যবহার এর আগে টম আর কোন দিনই পায়নি তার পালিকার কাছ থেকে।

লোকটি ধীরে ধীরে মেয়েটির শরীর থেকে পোশাকগুলোকে আলগা করে খুলে ফেলতে লাগল। দুহাতে মুখ ঢেকে সে শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, কোনই বাধা দিল না। তার সমস্ত শরীর তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল টমের উপর! হতভম্বের মতো কিছুই স্থির করতে না পেরে টম তখনও সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ মেয়েটি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল—অন্য কোন লোক যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। সে তাড়াতাড়ি কোন রকমে পোশাকগুলো সামলিয়ে শরীরের উপর জড়িয়ে নিল। তারপর টমকে কাছে ডাকল—'এদিকে আয় টম।' কথাটা শেষ করেই সে পাশের ঘরের দরজাটা খুলে দিল। কিন্তু নড়বার কোন লক্ষণই দেখা গেল না টমের।

'কে তোকে এখানে আসতে বলেছে?'—টম মাথাটাকে কেবল নামিয়ে নিল কিন্তু এক পাও নড়ল না।

মহিলা এবার একটা চাবুক তুলে নিল হাতে। তারপর বিছানার পাশেকার ছোট মাদুরটাকে পাশের ঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চাবুক দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে বিরক্তভাবে চেঁচিয়ে উঠল—'আজকাল আর কথা বুঝিস্ না কেমন? যা এখান থেকে বেরিয়ে যা।' কিন্তু টম আগেকার মতোই অচল। এদিকে লোকটি ক্রমশই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। পালিকা চাবুক দিয়ে কুকুরটাকে সপাং করে একটা আঘাত করল। তারপর তাকে পাশের ঘরে ঠেলে বের করে দিয়ে চাবুকটাকেও সেই ঘরে ছুড়ে ফেলে দরজা বন্ধ করে দিল।

ভোর বেলা ঘরের দরজা খুলল। কোট আর ধূসর রঙের টুপি পরে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। মহিলাটির পরনে সাদা একটা ড্রেসিং গাউন।

তার কোমল চুলগুলো এদিকে ওদিকে এলোমেলো—বিশৃঙ্খল। লোকটার কাঁধে হাত দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে তাকে বিদায় দিল।

হলের দিকের দরজাটা খোলাই ছিল। মহিলাটি এসে একটা আরাম কেদারায় বসে পড়ল। তারপর দুই হাত দিয়ে বুকটাকে চেপে ধরে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল সে। কিছুই দেখছিল না সে—কানেও কোন শব্দ ঢুকছিল না। হঠাৎ সামনের একটি শব্দে তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

চোখ ফিরাতেই সে দেখল: চাবুকটাকে দাঁতে চেপে অতি ভয়ে ভয়ে বিনীতভাবে টম তার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। কাছে এসেই সে পালিকার পায়ের কাছে মেঝের উপর নীরবে সেই চাবুকটা নামিয়ে রাখল। অনন্ত বিশ্বস্ততার দীপ্তি টমের চোখে মুখে জ্বলজ্বল করছিল।

চেরী ফুলে নাহি প্রয়োজন

'এর আগে বসন্তের এমন সমারোহ আর দেখা যায়নি কোন দিন। কিন্তু বন্ধু ভারুচা, তবু আমি বিষণ্ন,—বিষণ্ন আর পীড়িতও। মনে হচ্ছে যেন কোন অশোভন কাজ করে ফেলেছি।

হস্টেলে আমার জানালায় একটা গলাভাঙা বোতল দেখতে পাবে। একটা ভাঙা আর শুকনো বুনো চেরীর ডাল বসান তাতে। কাল রাতে ফেরার পথে ডালটা সঙ্গে করে এনেছিলাম······বোতলটার পানে তাকালেই কেন যেন আমার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করে।

ভেবেছি সাহস করে তোমাকে সব খুলে বলব। কিছুদিন আগে অন্য বিভাগের এক বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তার মতে—কোনরকম ভাবপ্রবণতাই নেই আমার মধ্যে। নিষ্কলঙ্কতা হারিয়ে অনুশোচনা করার লোকও আমি নই। প্রথম পতনের জন্য বিবেকের দংশন অনুভব করতে পারি তেমন অবস্থাও নয় আমার মনের। কিন্তু তবু কেন যেন ভয়ানক অস্বস্তি অনুভব করছি। কেন যে এই অস্বস্তি স্পষ্ট করে কিছুই বুঝতে পারছি না; কিন্তু এর অস্তিত্বটা অনুভব করছি সর্বক্ষণই।

কি করে ব্যাপারটা ঘটল তোমাকে নির্লজ্জভাবেই খুলে বলছি। কিন্তু তার আগে গুটিকয়েক প্রশ্ন করব তোমাকে।

পলের সঙ্গে যখন তোমার প্রথম মিলন হল, তখন কি ইচ্ছা হয়নি তোমাদের যে, ভালবাসার প্রথম দিনটা উৎসবের মাধুর্যে ভরে উঠুক? অর্থাৎ প্রতিদিনের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র হয়ে চিহ্নিত হয়ে থাকুক ঐ বিশেষ দিনটা?

একটা উদাহরণই নেয়া যাক। তোমার জীবনের সেই বসন্তোৎসবের

দিনটিতে একটা ছেঁড়া, ময়লা ব্লাউজ পরে অথবা একজোড়া নোংরা বুট পায় চাপিয়ে ঘরের বাইরে যাওয়াটা কি অপমানজনক বলে মনে হতো না তোমার ?

কথাটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি কেননা আমার পরিচিত বন্ধুরা অর্থাৎ আধুনিক যুগের মানুষেরা ব্যাপারটাকে দেখে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে। যা অনুভব করি তেমনি ধারায় চিন্তা করার বা কাজ করার সাহসের আমার নিতান্তই অভাব।

যাদের মধ্যে বাস করছি তাদের মধ্যে থেকে প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে যাওয়াটাও খুবই কষ্টসাধ্য।

সৌন্দর্যের প্রতি অবজ্ঞা দেখানোটাই বর্তমানে আমাদের তরুণদের প্রচলিত মনোভাব। পোশাকপরিচ্ছদের প্রাচুর্য, সৌখিনতা কিংবা ঘরের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

আমাদের হস্টেলটা একটা বিশৃঙ্খলার প্রতীক। চারদিকটাই নোংরা আর ময়লা। বিছানাগুলোতে পর্যন্ত শৃঙ্খলার অভাব। জানালার গোড়ায় পোড়া সিগারেটের টুকরা, ঘরগুলোর হাল্কা পার্টিশানের উপর ছেঁড়া প্ল্যাকার্ড আর বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। আমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে নিজের ঘরটাকে পর্যন্ত সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করে রাখতে চেষ্টা করে। কিছুদিন থেকে অন্য বাড়ীতে উঠে যাওয়ার গুজব রটায় ছাত্রেরা আরও বেশী যেন উদাসীন হয়ে পড়েছে। ইচ্ছা করেই এখন অনেক সময় তারা ঘরগুলোর ক্ষতি করতে শুরু করেছে।

মনে হয় যেন এমন কেউ আছে যার সামনে ঘরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করার মতো নগণ্য কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে আমরা নিতান্তই লজ্জিত। অবাধ স্বাস্থ্যকর হাওয়া ঢুকবে ঘরে এটাও যেন আমাদের লজ্জারই ব্যাপার। ভয়ানক কাজের চাপে হাতে সময়ের অভাব বলেই যে আমরা এমন

উদাসীন তা নয়। সৌন্দর্যের জন্য যে কোনরকম যত্ন নেওয়াটাই আমরা ঘৃণার চোখে দেখতে বাধ্য।

সব চেয়ে বিস্মিত হতে হয় এইজন্য যে আমরা সবাই জানি যে, আমাদের বর্তমান শাসকেরা, আমাদের শ্রমজীবি-শাসনতন্ত্র দরিদ্র হলেও অজস্র অর্থ ও শক্তি ব্যয় করছেন শুধু সব কিছুকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে। সারা শহরময় এমন সব ফুলের বাগান বসিয়েছেন এঁরা, ধনিকদের আধিপত্যে যার কল্পনাও কেউ করতে পারেনি। যদিও সুন্দরকে ভালবাসে বলে তাদেরও গর্বের অন্ত ছিল না। আজ সমস্ত মস্কো শহরটাই স্টাকোর ঔজ্জ্বল্যে যেন হাসছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টা একটা ভাঙ্গা পুলিশ স্টেশনের মত এতদিন কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়েছিল; কিন্তু আজ সৌন্দর্যের দিক থেকে সারাটা মস্কো শহরে এর তুলনা মেলা ভার।

আর আমরা…এত সুন্দর বলে,—ইচ্ছা না থাকলেও গর্বে এর জন্য বুক আমাদের ভরে ওঠে। নূতন শাসনতন্ত্রের কর্তৃত্বে পরিশুদ্ধ হয় উঠলেও, এই সব দেয়ালের অন্তরালে আমাদের জীবনে আজ বিশৃঙ্খলা আর নোংরামির অবাধ রাজত্ব।

সব মেয়েরা আর আমাদের ছেলে বন্ধুরাও এমনভাবে চলাফেরা করে যেন ভাল ব্যবহার বা সৌজন্যকে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে এরা নিতান্তই ভীত। ইচ্ছা করেই তারা তাদের কথাবার্তার মধ্যে নোংরামির প্রশ্রয় দেয়। পরস্পরের পাছাতে চাপড় মেরে কথা বলাটা তাদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। যৌন ব্যাপার সম্বন্ধীয় কথা উঠলেই, রাস্তার লোকদের মতো তাদের মুখে জঘন্য আর ইতর বুলির ছড়াছড়ি। অশ্লীল আর নোংরা কথার অবাধ রাজত্ব চলছে আজ আমাদের ভাষায়। এই সব ব্যাপারে যখন আমাদের কোন মেয়ে,—(সবার কথা বলছিনে)—মর্মাহত

হয় তখন অবস্থা দাঁড়ায় আরও গুরুতর। অবশিষ্টের দল লেগে যায় তখনি তাদের "মাতৃভাষায়" অভ্যস্ত করে তুলতে।

সিনিসিজম, নোংরা কথা আর সৌন্দর্যের প্রতি অবহেলা এখন আমাদের মনের উপর অবাধ রাজত্ব চালাচ্ছে। এর কারণটা বোধ হয় আমাদের দারিদ্র্য। পোশাক পরিচ্ছদে ইচ্ছানুরূপ খরচ করবার মতো ক্ষমতা আমাদের কারোরই নেই। সুতরাং সব কিছুকেই অবজ্ঞা করছি আমরা অন্ততঃ অবজ্ঞা করার ভান করছি। আমরা নিজেদের বিপ্লব বাহিনীর সৈনিক বলে মনে করি সেও হয়ত এই অবজ্ঞার একটা কারণ হতে পারে। কেননা সৈনিকের কাছে ভাবপ্রবণতা কিংবা সৌন্দর্যবোধ স্বভাবতই অস্বাভাবিক। কিন্তু সত্যি করে যদি বিপ্লবী সৈনিকই হই আমরা তাহলে যে ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করেছি, তাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করাই আমাদের উচিত। কেবল সৌন্দর্য্যের জন্যই জীবনে সৌন্দর্যসাধনা করব তা নয়, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জন্যও সৌন্দর্যচর্চার আজ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। এইজন্যই মনে হয়, ব্যারাক জীবনের এই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি বর্জন করে চলার সময় এসেছে আমাদের।

কিন্তু তুমি বোধ হয় জান, বেশীর ভাগ লোকই আজ পছন্দ করছে এই জীবন। ছেলেদের কথা নাই বা বললাম, মেয়েরাও এই ধরনের জীবন যাত্রারই পক্ষপাতী। এ নাকি তাদের অধিক স্বাধীনভাবে চলাফেরায় সাহায্য করে। তাছাড়া এই ধরনের জীবনযাত্রায় নিজেদের ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করারও বিশেষ প্রয়োজন নেই তাদের।

কিন্তু সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যের প্রতি এই অবজ্ঞার ফলে আমাদের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের মধ্যে স্থূলতা দিন দিনই বিকৃত রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে,— ভদ্রতা ও ভব্যতার মুখোস যাচ্ছে খসে। কোন বান্ধবীর প্রতি যে কোন রকম সহানুভূতি বা যত্ন দেখাতেও আমাদের শঙ্কার আর অন্ত নেই।

অলিখিত নীতিশাস্ত্রের গণ্ডি অতিক্রম করার ভয় থেকেই এ সবের উদ্ভব বলে আমার ধারণা।

অ্যাকাডেমিতে তোমার অবস্থা অন্য রকম। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছি বলে মাঝে মাঝে অনুশোচনা হয় এখন। আমার মা গ্রামে ধাত্রীর কাজ করেন। নিজের মেয়ে হলেও আমার প্রতি তাঁর সম্ভ্রমের অন্ত নেই। আমাকে তিনি সাধারণতঃ সাধারণের চেয়ে একটু উঁচু ধরনের জীব বলে মনে করেন। কিন্তু যে নোংরামির মধ্যে আমরা জীবন কাটাচ্ছি তা দেখলে না জানি তিনি কি ভাববেন। যে রকম বিশ্রী ভাষায় কথা বলতে আমরা অভ্যস্ত তা শুনলে তাঁর হয়ত বিস্ময়ের আর অবধি থাকবে না।

আমাদের কাছে প্রেমের কোন অস্তিত্ব নেই। প্রেম বলতে লোকে যা বোঝে আমাদের ধারণা তা থেকে অন্য রকম। আমাদের মতে প্রেম কেবল যৌন সম্বন্ধ। সুতরাং প্রেমকে আমরা মনোবিজ্ঞানের পাতায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছি। আমাদের বেঁচে থাকার অধিকারকে বুঝতে হলে শরীরতত্ত্বের দিক থেকেই তাকে বুঝতে হবে।

মেয়েরা তাদের পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে নিঃসংকোচে বাস করছে। এক সপ্তাহ কিংবা একমাস তাদের সঙ্গে বাইরে কাটিয়ে আসাটা ওদের কাছে নিতান্তই সামান্য ব্যাপার। একটা রাত নির্বিচারে এবং অসংকোচে একসঙ্গে যাপন করা ওদের চোখে মোটেই দোষের নয়। প্রেমের মধ্যে শারীরিক আকর্ষণ ছাড়া অন্য কিছু খুঁজতে বসলেই পাগল বলে ওরা তোমাকে উপহাস করে উড়িয়ে দেবে।

সে নিজেকে কি ভাবে কে জানে? অতি সাধারণ একজন ছাত্র—গায়ে নীল কোট, গলার কাছেকার বোতাম খোলা—পায়ে উঁচু বুট। কপালের উপর থেকে এলোমেলো চুলগুলোকে সব সময়ই পিছনের দিকে

সরিয়ে দেওয়া তার অভ্যাস। তবে চোখ দুটো তার খুবই সুন্দর। এবং সেই চোখই আমাকে মুগ্ধ করেছিল প্রথম। আপন মনে করিডরের উপর দিয়ে যখন সে হেঁটে বেড়ায় তার চোখে নেমে আসে এক অপূর্ব প্রশান্তি। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলেই সে হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ এক নূতন মানুষ। অশিষ্টতা ও অসংযমের তখন সে এক জ্বলন্ত প্রতীক।

সুন্দর বলে বলে মেয়েরা তাকে নিজের সম্বন্ধে অতিরিক্ত রকম সচেতন করে তুলেছে। ছেলেরাও এদিক দিয়ে বড় কম করেনি। তাদের মতে সে নাকি ভয়ানক চালাক। তাই এই সব ব্যাপারে নিজের নেতৃত্ব হারাতে তার অত্যন্ত ভয়।

তার মধ্যে আমি দুজন মানুষকে আবিষ্কার করেছি। একজন অন্তরের শক্তিতে প্রাণবান—মনে তার চিন্তার গাম্ভীর্য। আর একজন নিতান্তই ছ্যাবলা—নিজের অশিষ্ট ব্যবহারে যে অন্যের মনে বিরক্তি জাগিয়ে তোলে! প্রকৃতপক্ষে সে যতটা নয় তার চেয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে চায় অনেক বেশী অসংযত বলে।

গতকাল সূর্যাস্তের সময় প্রথম আমরা একসঙ্গে বাইরে বেড়াতে বেরু হই। শহরের উপর সন্ধ্যার স্তব্ধতা তখন নিবিড় হয়ে নেমে এসেছে। রাস্তার কোলাহল নিষ্প্রভ নিস্তেজ। চারিদিকের আবহাওয়া ঝরঝরে—পরিষ্কার। স্কোয়ার থেকে ভিজে মাটীর মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল।

'আমার ওখানে চল। এখান থেকে বাসা আমার খুব বেশী দূরে নয়।'—সে বলল।

'না, এখন আর যাব না।'

'কেন—ভদ্রতা?'

'প্রথম কথা, ভদ্রতার জন্য বলছি নে। দ্বিতীয়তঃ ঘরের বাইরেই এখন বেশ ভাল লাগছে।'

আমার কথাটা শুনতেই সে কাঁধটাতে একটা ঝাঁকুনি দিল। জেটির ধার ঘেঁষে বেড়াতে বেড়াতে টানা পুলটার কাছে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। একটি মেয়ে ফুলন্ত চেরীর ডাল বিক্রি করছিল। আমি একটা ডাল কিনলাম তার কাছে থেকে। ফিরতি পয়সার জন্য বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল আমাকে সেখানে। একপাশে দাঁড়িয়ে কপাল কুঁচকিয়ে ছেলেটি একবার চেয়ে দেখল আমার দিকে।

'চেরী ফুল না হলে চলেনা বুঝি ?'

'চলবে না কেন ? তবে না থাকার চেয়ে চেরী ফুল থাকাই ভাল।'

'আমি ত সব সময় চেরী ফুল ছাড়াই চালাই। কই তাতে ফল খারাপ হয় বলে ত মনে হয় না।' মুখ বিকৃত করে হাসতে হাসতে সে কথাগুলো বলে গেল।

আমাদের সামনেই দুজন মেয়েকে দেখলাম। একদল ছাত্র লেগেছে তাদের পিছনে। নিজেদের বাঁচিয়ে কোন রকমে ওরা দূরে সরে যেতেই ছেলেদের মধ্যে সেকি হল্লা। ওদের সম্বন্ধে নানা রকম অশ্লীল ইঙ্গিত ক'রে ছেলেগুলো চীৎকার করে ওদের যা খুশি বলতে শুরু করে দিল।

'ছেলেগুলো মেয়ে দুটোর মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে। চেরী ফুল ছাড়া ওদের কাছে ঘেঁষেছিল তাই ওরা ভয় পেয়ে গেছে।' আমার সঙ্গীটি বলল।

'চেরী ফুলের উপর আপনার এত রাগ কেন বলুন দেখি ?' তাকে প্রশ্ন করলাম।

'চেরী ফুল থাকলেও যা না থাকলেও তাই। সব কিছুর পরিসমাপ্তি একই ধরনের। সত্য ঢেকে ত আর লাভ নেই কিছু।'

'জীবনে ভালবাসেন নি কাউকে তাই এমনি ধরনের কথা বলতে পারছেন।'

'ভালবাসার এমন প্রয়োজনই বা কি ?'

'মেয়েদের মধ্যে তাহলে আর কি আছে আপনার জন্যে ?

'রাখ, তোমার ঐ চীনা আদবকায়দা। আমাকে আপনি না বলে তুমি বলেই ডেকো! মেয়েদের কথা বলছ? আমার জন্য তাদের মধ্যে অনেক কিছু আছে বই কি। জোর করেই বলতে পারি বেশ অনেকখানিই আছে।'

'আমি কিন্তু আপনাকে তুমি বলতে পারব না তা আগে থেকেই বলে রাখছি। কেননা সবাই যদি তুমি বলতে শুরু করে তবে আর এর মাধুর্যটুকু থাকবে না।'

ততক্ষণে গুটি কয়েক লাইলাকের ঝোপ পার হয়ে এসেছি আমরা। ব্লাউজের উপর চেরীর গুচ্ছটা এঁটে নিতে একটুখানি থামতে হল আমাকে। হঠাৎ আমার মাথাটাকে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে সে আমাকে চুমু খেতে চেষ্টা করল।

আমি হাত দিয়ে তাকে পিছনের দিকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম।

'তাহলে এ চাওনা তুমি? বেশ না চাইলে।' বেশ শান্ত ভাবেই সে কথা কয়টি বলে গেল।

'না, এ আমি চাইনা। ভালবাসতেই যখন জানেন না, তখন যে কোন শ্রেণীর মেয়েকে চুমু খাওয়াই আপনার কাছে সমান। আমি না হয়ে অন্য কোন মেয়ে হলে তাকেও ঠিক এমনি ভাবেই চুমু খেতে চাইতেন আপনি।'

'নিশ্চয়ই। মেয়েরাও যাদের চায় তাদেরই চুমু খায়। কোন এক জনকে নিয়ে মশগুল থাকে না তারা। কিছুদিন আগে আমাদের এক প্রীতিভোজ হয়। আমার এক বন্ধুর ভাবী পত্নী উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনি আমার বন্ধুটিকে যে আন্তরিকতা নিয়ে চুমু খান আমাকেও ঠিক তেমনি নিবিড় ভাবেই চুমু খেলেন। অন্য কেউ উপস্থিত থাকলে তাকেও

তিনি নিবিড় ভাবেই গ্রহণ করতেন। অথচ প্রেমে পড়ে রেজিষ্টারি আপিসে গিয়ে তারা বিয়ে করেছে। এই নিয়মই ত চলছে।'

তার এই ধরনের কথা শুনে অন্তর আমার তার উপর বিরক্তিতে ভরে উঠল। ভেবেছিলাম আমার উপর হয়ত তার খানিকটা আসক্তি আছে। কতদিন আমার একটুখানি দৃষ্টি লাভের জন্য সে আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অন্য ছাত্রীদের ভিড়ে মিশে থাকলেও সে আমাকে রেহাই দিতে চায় নি। আর আজ বসন্তের এই মদির সন্ধ্যাটা এমন নোংরা আর জঘন্য চিন্তা দিয়ে সে কলঙ্কিত করল। ছোট ছোট মধুর কথা আর কোমল অনু-ভূতির মধ্যে মানুষ যখন চায় নিজেকে ভুলে থাকতে সে তখন সেই মুহূর্তটাকে মলিন করে দিল কামনার স্থূল অনুভূতি দিয়ে।

তার উপর সেই মুহূর্তে মন আমার ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল। আমরা তখন একটা বেঞ্চের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম একটি মহিলা বেঞ্চটার উপর বসে আছে। তার পরনে সিল্কের মোজা,—পা দুটো হাঁটুর কাছে আড়াআড়ি ভাবে সংবদ্ধ। যে কেউ সামনে দিয়ে যাচ্ছে তার দিকেই চোখ তুলে তাকাচ্ছিল সে।

আমার সঙ্গীটি সেই মহিলাটির দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। কিছুদূর এগিয়ে গিয়েও সে আবার তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। আমার মনে হচ্ছিল তখন কেউ যেন আমাকে চাবুক মারছে।

'চল ঐখানটায় বসা যাক।' পরের বেঞ্চটার কাছে এসে সে বলল। সেখানে বসার অর্থ মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকবার সুযোগ পাবে সে সেখান থেকে।

হঠাৎ সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল আমার মধ্যে। মনে হল হয়ত বা চীৎকার করে কেঁদে উঠব। পাছে আর সহ্য করতে না পারি তাই তার সঙ্গে আর বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব নয় জানিয়ে বিদায় নিলাম।

আমার প্রস্তাব শুনে একেবারে থমকে গেল সে। অন্ততঃ মর্মাহত হয়েছে বলে মনে হল তাকে। 'কেন?' সে প্রশ্ন করল। 'তুমি কি চাওনা আমি অকপট হই? আমার চিন্তাগুলোকে যদি সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে মিথ্যা কথা বলতাম তাহলে কি ভাল হত?'

'সাজানগোছানর প্রয়োজন হয় না—এমন কিছু তোমার মধ্যে নেই বলে আমি দুঃখিত।'

'তাহলে এখন কি করবে?' আমি কি বললাম কিছুই যেন বুঝতে পারেনি এমনিভাবে সে প্রশ্ন করল।

'আমিও তাহলে চললাম, বিদায়।'

এক মুহূর্তের জন্য আমার হাতখানা সে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল। 'ব্যাপারটা কিন্তু নিতান্তই বোকামি হল—নিছক নির্বুদ্ধিতা।' কথাটার পুনরাবৃত্তি করতে করতে সে আমার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

ভারি বিস্ময় লাগল আমার। সে যে এমন ভাবে চলে যাবে এ আমি ভাবতেও পারিনি।

রাস্তাটার দুধারে অসংখ্য গাছের সারি। প্রশস্ত রাস্তাটার একপাশে দাঁড়িয়ে চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। মে মাসের তেমনি একটা রাত যখন মনে হয় কেবলমাত্র সেই রাতটার জন্যই চারদিকে এই জীবনের সমারোহ। এর পুনরাবৃত্তি হয়ত আর কোন দিনই হবে না। আকাশের বুকে চাঁদ স্থির হয়ে জ্বলছে। আকাশের এখানে ওখানে ছেঁড়া টুকরো মেঘের ভিড। অগণিত বাড়ী আর ক্রেমলীনের গম্বুজের অন্তরালে বহুদূরে সূর্যের শেষ রশ্মি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে রাস্তার আলো-গুলোকে চাঁদের আলোতে নিষ্প্রভ মনে হচ্ছিল। ক্যাথেড্রালের সামনের বাগানে আলোর বন্যা উচ্ছল প্রাচুর্যে নেমে এসেছে। অসংখ্য হাস্যোজ্জ্বল

তরুণতরুণীর ভিড় সেখানে। খাটো করে ছাঁটা গাছ,—লাইলাকের ঝোপ আর ছায়ায় ঢাকা বাগানের বেঞ্চগুলোর উপর অগণিত প্রেমিক-যুগল।

হাল্কা কথা আর হাসির টুকরো টুকরো গুঞ্জনধ্বনি। জলন্ত সিগারেটের প্রান্তগুলি ঝিকমিক ক'রে জ্বলছে। রাত্রির মধুর উত্তাপে সবারই মন নেশায় ভরপুর। এর একটা মুহূর্তও কেউ বৃথা নিষ্ফল হতে দিতে রাজি নয়।

কিন্তু এমন রাতে তোমার অন্তরের বীণা যখন সুপ্ত,—সঙ্গীহীন জীবনে একান্তই নিঃসঙ্গ তুমি, তখন যে বেদনা জেগে ওঠে তোমার বুকে, কোন বেদনা দিয়েই তার পরিমাপ হয় না।

এক মুহূর্ত আগেও আমি উদাসীন ছিলাম। সে সঙ্গে আছে কি নেই খেয়ালও করিনি। কিন্তু বেঞ্চে উপবিষ্ট সেই মহিলার প্রতি তার উৎসুক দৃষ্টি আমাকে পেয়ে বসল। হঠাৎ মনটা কেমন যেন করুণ হয়ে উঠেছে অনুভব করলাম। ভারি দুর্বল মনে হচ্ছিল নিজেকে। তার সান্নিধ্য ছাড়া জগতে তখন আর আমার কিছুই কাম্য নেই।

আমায় অভিশাপ দিও না বন্ধু। বসন্তের এই উৎসবময়ী রাত্রিতে সঙ্গীহীন আমি বন্ধুর সান্নিধ্য থেকে দূরে দূরে ঘুরে বেড়াব এ আমার পক্ষে অসহ্য।

এর পরে কে কি ভাববে কিছুই চিন্তা করিনি। শুধু মনে পড়ে তখনি তাড়াতাড়ি তার বাসার দিকে পা বাড়ালাম।

একটিমাত্র কথা ছাড়া তখন আর কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। হয়ত সে বাড়ী নেই,—দেরি করে ফেলেছি হয়ত বা অনেকটা, হয়ত বা এই ভুলের জন্য একলাই কাটাতে হবে আমাকে। তার চরিত্রের ভাল দিকটা না দেখেই অমন হাস্যকর ভাবে পালিয়ে এসেছি বলে নিজেকেই তখন ধিক্কার দিচ্ছিলাম।

অপ্রীতিকর অবস্থায় অতৃপ্ত মানুষ নিজের ভাল করতে চেষ্টা না করেই যেমন অবজ্ঞায় দূরে সরে যায় আমিও ঠিক তাদের মতোই ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ নিজে নিশ্চেষ্ট থেকেও অধিকতর ভাল জিনিস পাবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল আমার মনে।

শেষ পর্যন্ত পুরনো পাথরের বাড়ীটার দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বাইরে মে-রাত্রির উত্তপ্ত মধুর বাতাসের সঙ্গে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা দেয়ালের মধ্যেকার অবরুদ্ধ আবহাওয়ার পার্থক্য স্পষ্টভাবে অনুভব করছিলাম।

এমনি ধরনের দরজা এখন পর্যন্ত মস্কো শহরে অনেক দেখতে পাওয়া যায়। এখানে ওখানে ছেঁড়া বিজ্ঞাপন ঝুলছে,—বাইরের সিঁড়িগুলোতে বহুদিনের নোংরা আবর্জনা জমে জমে স্তূপীকৃত হয়ে আছে,—জল আর ঝাঁট কতদিন যে পড়েনি সেখানে কে বলতে পারে ?

আমাকে যে তার সেখানে দেখতে পাবে এ ধারণাও সে করতে পারেনি। তাকে দেখে মনে হল কোন কাজ নিয়ে বসবার উদ্যোগ করছিল সে। দেয়ালের কোল ঘেঁষে ছোট্ট একখানা টেবিল,—দেখতে অনেকটা রঙ্‌করের টুলের মতো। ছাদ থেকে একটা ইলেক্‌ট্রিকের বাল্‌ব নীচের দিকে ঝুলে নেমেছে। টেবিলের উপর টেনে এনে আলোটাকে সে একটা পেরেক দিয়ে আটকে রেখেছে।

'তাহলে বীরাঙ্গনা আবার ফিরে এলে! এতক্ষণে ভুল ভেঙেছে নিশ্চয়ই। যাক্ ভালই হল।'

হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বোধহয় আমাকে চুমু খেতে কিংবা আদর করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু কেন যেন কোন কিছুই করল না শেষ পর্যন্ত।

'আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেছি বলে দুঃখিত আমি; ঝগড়াটা

মিটিয়ে ফেলতে তাই এতদূর আবার ছুটে এলাম'—বললাম আমি তাকে।

'কই, কি আর এমন ঝগড়া হয়েছে যার জন্য এতটা ব্যস্ত হয়েছ। একটু অপেক্ষা কর। আমি ভিতরে নেই বলে দরজায় একটা নোটিশ টাঙিয়ে রেখে আসছি। তা নইলে হয়ত বা এখনই অন্য কেউ এসে পড়বে।'

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নোটিশটা লিখে সেটা নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল সে! ঘরের মধ্যে একলা বসে চারদিকটা ভাল করে চেয়ে দেখলাম।

তার ঘরের অবস্থাও বাড়ীর নোংরা সিঁড়িটার মতোই। দেয়ালের গায়ে এখানে ওখানে টেলিফোনের নম্বর টোকা,--মেঝের উপর পোড়া সিগারেটের টুকরো আর ছেঁড়া কাগজের ছড়াছড়ি। বহুদিন যে ঝাঁট পড়েনি সেখানে তা মেঝে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। দেয়ালের একপাশ ঘেঁষে অপরিচ্ছন্ন জড়ানো বিছানাটা আমাদের হস্টেলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। জানালার গোড়ায় নোংরা ডিস, খালি বোতল, মাখন-বাঁধা কাগজ—ডিমের খোলস, কড়াই আরো কত কি।

কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। ফিরে এলে কি বলব তাকে কিছুই যেন হদিস করে উঠতে পারছিলাম না। চুপ করে থাকাটাও কোন রকমে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কেননা তাতে হয়ত সম্পূর্ণ অন্য কিছু ধারণা করে নিতে পারে সে।

হঠাৎ নিজেকে প্রশ্ন করলাম—'আচ্ছা দরজায় ওর নোটিশটা টাঙাতে যাওয়ার তাৎপর্য কি? অন্য কেউ এলেই বা ক্ষতির কি সম্ভাবনা থাকতে পারে?'

একটু ভাবতেই সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। কথাটা মনে হতেই কেমন যেন মাথাটা ঘুরতে লাগল। দম বন্ধ করে রইলাম

খানিকক্ষণ। উত্তেজনায় বুক তখন আমার তোলপাড় করছে। জানালার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালাম। সিগারেটের বাক্স আর বোতলগুলো সরিয়ে সেখানটায় একটু বসব ভাবলাম। আমার হাত কাঁপছিল তখন। কোনরকমে জায়গাটা পরিষ্কার করে পেটের উপর চাপ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম।

আমার পিছনে কি ঘটছে অধীর আগ্রহে তা জানবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রত্যাশার উন্মুখতায় এমন চাঞ্চল্য জীবনে আর কোনদিন অনুভব করিনি।

দুঃখ হচ্ছিল শুধু এই ভেবে যে, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত কয়টি, আমার ভালবাসার প্রথম দিনটা বোধ হয় এই নোংরা ঘরের পঙ্কিল আবহাওয়ায় গতকালের উচ্ছিষ্টের মধ্যে যাপন করতে হবে।

সে ঘরে ফিরে আসতেই তাই বাইরের খোলা হাওয়ায় যাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ জানালাম।

তার মুখের উপর বিস্ময় আর বিরক্তির ছায়া ঘনীভূত হয়ে উঠল।

'কেন?' সে প্রশ্ন করল। 'এখনি ত বাইরে থেকে এলে! পর মুহূর্তেই তার কণ্ঠস্বর গেল বদলিয়ে।

'কেউ আমাদের বিরক্ত না করে তাই নোটিশটা বাইরে টাঙিয়ে রেখে এলাম। বাজে কথা রেখে দাও। তোমাকে এখন কোথাও যেতে দিতে আমি রাজি নই।' দ্রুতগতিতে সে কথাগুলো উচ্চারণ করে গেল।

...'মোটেই ভাল লাগছে না এখানে আমার।'

'আবার সেই পুরনো সুর ধরলে'...বিরক্ত ভাবে বলে উঠল সে। 'কেন কি হয়েছে এখানে? কোথায় যেতে চাচ্ছ তুমি?' দ্রুত-উচ্চারিত কথাগুলো বেধে যাচ্ছিল তার গলায়। আমাকে বাধা দেওয়ার কথা ভেবে তার হাত কাঁপছিল।

আমার হাতও কাঁপছে অনুভব করলাম। উত্তেজনায় বুক এমন তোলপাড় করছিল যে চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার দেখছিলাম। আমার মনে তখন সমস্যার তুফান তুলছে। একদিকে :—নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার চিন্তা—অন্যের উপস্থিতিতে বাধা না পাওয়ার অনুভূতি; আর অন্যদিকে :—চোরের মতো ফিস্ ফিস্ কথা, লোভী ত্রস্ততা—তার অসংযম ও ধৈর্যহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু তার মনে তখন একটিমাত্র চিন্তা। কোন বন্ধুর আবির্ভাবের আগেই তাড়াতাড়ি সে সব কিছু শেষ করতে চায়। আমার তরফ থেকে সামান্য একটু বাধাদানের প্রচেষ্টাতেও বিরক্তি ও অধৈর্যে তার মন ভরে উঠেছিল।

আমরা মেয়েরা অবাধ-প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রকৃত ঘটনার দিকে সোজা ভাবে তাকিয়ে দেখতে অক্ষম। আমাদের কাছে সত্য উদ্ঘাটিত হয় সব সময়েই অধ্যায়ের শেষ ভাগে। প্রথম দিকে আমরা কেবল মুগ্ধ হই। মানুষের মন, প্রতিভা, হৃদয়, তার কোমলতা সব কিছু আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা সব সময়ই প্রথমে যা চাই তা দৈহিক মিলন নয়—অন্য কিছু। এই অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা যখন অপরিতৃপ্ত থেকে যায় তখন মেয়েরা অভিভূত হয়ে পড়ে তাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক অনুভূতিতে। তখন তাদের অভিজ্ঞতায় যা ধরা পড়ে তা পূর্ণতা বা আনন্দ নয়, নিছক বিরক্তি ও অতৃপ্তি। তখন তাদের সমস্ত বিদ্বেষ গিয়ে পড়ে সেই মানুষটির উপর তাদের মতে যে তাদের এই ঘৃণ্য ও অতৃপ্তিকর প্রত্যক্ষতার মধ্যে টেনে এনেছে।

বিশৃঙ্খল নোংরা বিছানা, জানালার প।.শকার ডিমের খোলা,—তার অসংযত লোভী দৃষ্টি ;—যে রকম ভাবে ব্যাপারটা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত তা না হওয়ার অনুভূতি, এই সব কিছু মিলে আমাকে ইতিমধ্যেই নিরুৎসাহ করে ফেলেছিল।

'আমি থাকতে পারব না এখানে'—চীৎকার করে বলে উঠলাম আমি। বুক ঠেলে কান্না উছলে উঠছিল আমার।

'কেন কি হলো এখানে? এই সব আসবাবপত্র পছন্দ হচ্ছে না? এর মধ্যে কবিত্ব নেই মোটেই, না? কিন্তু আমি ত একজন ব্যারন নই—' চীৎকার করে বলে উঠল সে। এবার আর বিরক্তি চাপতে পারল না সে।

মনে হয় তার চীৎকারে আমার মুখের চেহারা পর্যন্ত বদলে গিয়েছিল। কেন না তার কথায় ভয়ানক মর্মাহত হয়েছি মনে করে তাড়াতাড়ি সে আমায় তক্ষুনি সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল।

'কেন অমন করছ বল ত? একটু থাম না……এখনি হয়ত অন্য কেউ এসে পড়তে পারে।'

তখনই আমার সে স্থান ছেড়ে চলে আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেই নির্জন ঘরে তার সান্নিধ্য আমার মনকেও তার মতই কামনায় উদ্দীপ্ত করে তুলল। ইচ্ছা করেই আত্ম-প্রবঞ্চনার পথ বেছে নিয়ে সেইখানেই রয়ে গেলাম। মনকে মিছামিছি বুঝাতে চেষ্টা করলাম হয়ত অন্য কেউ এসে বিঘ্ন ঘটাবে।

'একটু অপেক্ষা কর। তোমার জন্য কিছু কবিত্বের ব্যবস্থা করছি।' কথাটা বলেই সে আলোটা নিভিয়ে দিল।

এতে বরং খানিকটা ভালই মনে হচ্ছিল। কেননা নোংরা বিছানা, বোতল অথবা মেঝের উপরকার পোড়া সিগারেটের টুকরাগুলো তখন আর দেখা যাচ্ছিল না।

তারদিকে পিছন দিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাছে এসেই একখানা হাত দিয়ে সে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরল। আমি তখন জানালার বাইরে তাকিয়ে আছি। তার মুখের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু সেই আলিঙ্গনের জন্য তার কাছে নিজেকে কৃতজ্ঞ

মনে করছিলাম। এমনি ভাবে আরও বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পেলে খুশিই হতাম।

কিন্তু সে তখন নিতান্তই অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তার সব সময়ই ভয়— বন্ধুরা পাছে কেউ এসে পড়ে।

'কতক্ষণ আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে ?' হাত দিয়ে জানালার পাশ থেকে আমাকে সরিয়ে আনতে আনতে সে প্রশ্ন করল।

আমরা উঠতেই প্রথমে সে আলোটা জালিয়ে দিল।

'আলোর প্রয়োজন নেই আমার'—ভয়ে দুঃখে প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলাম।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে একবার সে তাকাল আমার দিকে। তারপর তক্ষুনি আলোটা নিভিয়ে দিল আবার। বিছানায় গিয়ে সে তখন বিছানাটা ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত।

'বন্ধুর বিছানাটা ঠিক করে রাখাই উচিত। নয়ত ভানিয়া ভাববে ঘরে কোন মেয়ে নিয়ে এসেছিলাম আমি।' সে বলল।

বিছানার চারদিকে উপুড় হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সে তখন কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

আমি তখন একলা বসে আছি। একটু পরেই সে আমার কাছে এল। নিজের অনিচ্ছায় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আমার বুক ঠেলে। তাকে দেখতে মাথাটা একবার ফিরালাম। মনের বিধ্বস্ত অবস্থাটা দমন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম। সে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

'এই নাও তোমার চুলের কাঁটা। এর জন্য কি গড়াগড়িটাই না দিতে

হল এতক্ষণ মেঝের উপর। আলো ছাড়া থাকতে পার কেমন করে? আর দেরি করোনা, বেরিয়ে পড় তাড়াতাড়ি, নয়ত এখনি অন্য কেউ এসে পড়বে। পিছনের দরজা দিয়ে চল, তোমায় এগিয়ে দিচ্ছি। সামনের দরজা হয়ত এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে।'

আমাদের মধ্যে আর কোনই কথা হয়নি। দুজনেই দুজনের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলাম।

রাস্তায় বেরিয়েই খানিকক্ষণ যন্ত্রের মতো এগিয়ে চললাম। কোন কিছু চিন্তা করার ক্ষমতাই ছিল না তখন আমার। হঠাৎ হাতে কি যেন একটা কঠিন জিনিসের স্পর্শ অনুভব করলাম। সে আমার হাতে চুলের কাঁটা গুঁজে দিয়েছিল মনে পড়তেই সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। কেন যেন পথের মধ্যেই থেমে কাঁটাগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। চুলের কাঁটাই বটে—চুলের কাঁটা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

কাঁটাগুলো হাতে করেই কোন রকমে টলতে টলতে বাড়ী ফিরে এলাম। সেই চেরীর গুচ্ছটা তখনো আমার ব্লাউজের বুকে লেপটে লেগে ছিল। মুষড়ানো ফুলগুলো ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো নেতিয়ে পড়েছে।

সেই একই রাত্রি সমস্ত শহরের উপরেই তার প্রভাব বিস্তার করে জেগে আছে। অগণিত বাড়ীর মাথার উপর দিয়েও বহু উর্ধ্বে আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। টুকরো টুকরো ভাঙা মেঘগুলো কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার মতো প্রতীয়মান হচ্ছে। সেই একই দিকসীমা শহরের প্রান্ত পেরিয়েও বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত।

আপেল ফুল,—বুনো চেরী আর ঘাসেরও সেই একই মধুর গন্ধ······

এ নিয়ে চিন্তা করো না

তরুণ কমিউনিষ্টলীগের একজন সভ্য ট্রামের নীচে চাপা পড়ায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বহু লোকের ভিড় জমে উঠেছে তাদের পিছনে ব্যাপার কি দেখবার জন্য।

ছেলেটির কাটা ডান হাতটা একজন বাহকের কোমরবন্ধের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। কোটের খানিকটা থেঁৎলানো হাতা তখনো হাতটার সঙ্গেই লেপটে রয়েছে। হাতটা থেকে জমাট বিবর্ণ রক্ত করিডরের মেঝের উপর ফোঁটা ফোঁটা করে গড়িয়ে পড়ছিল, মাংসের কাবাব থেকে যেমন করে রক্ত ঝরে পড়ে।

ছেলেটির মাথা স্ট্রেচারের উপর সোজা পিছনের দিকে নেতিয়ে পড়েছে—মুখ বিবর্ণ—কপালটা ঘামে একেবারে ভিজা—মাথার চুলগুলো কপালের পাশে লেপটে রয়েছে। একটা রক্তমাখা ভাঙা টুপি ছেলেটির পেটের উপর পড়ে আছে।

'এই ত বাইরে রাস্তায় ওখানটায় কাটা পড়ল'—সংজ্ঞাহীন ছেলেটিকে আমেরিকান চাদরে ঢাকা একটা বিছানার উপর শুইয়ে দিতে দিতে একজন স্ট্রেচার-বাহক উত্তর দিল।

'চলন্ত ট্রাম থেকে যেই লাফিয়ে নেমেছে অমনি উল্টো দিক থেকে আর একখানা ট্রাম এসে ধাক্কা দিয়ে ওকে ট্রলি-কারের নীচে ফেলে দিল।'

* * * *

মিনিট কয়েক পরেই ছেলেটির সংজ্ঞা ফিরে এল। কোন রকম নাড়া-চাড়া না করেই চোখ মেলে তাকাল সে,—গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ যেন সে জেগে উঠেছে এমনি ভাবে। তারপর ছাদের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চারদিকে তাকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের দিকে সে চোখ দুটোকে ফেরাতে চেষ্টা করল।

সাদা পোশাক-পরা একজন সার্জন তার সামনে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল —'আচ্ছা ভাই, আগে তোমার বাপ-মার নাম আর ঠিকানাটা বল দেখি। তারপরে খুব সাহস দেখাতে হবে কিন্তু বুঝলে? তোমার পদের মর্যাদা রাখা চাই।'

'সে নিয়ে চিন্তা করবেন না আপনি'—একটুও হাসবার চেষ্টা না করে, সার্জনটিকে নিবিষ্টভাবে চেয়ে দেখে সে কথা কয়টি বলে উঠল—বেশ একটু বিরক্তভাবেই। কোন কারণে কেন যেন সার্জনটিকে তার মোটেই ভাল লাগল না।

'টেলিফোন নম্বর ১—৭৩—৪০, আলেকজেন্দ্রোভা……কিন্তু এ-সব জানতে চাচ্ছেন কেন বলুন দেখি?'

'অতি সহজ কারণ। তোমার হাতখানা কাটা গেছে কিনা তাই। একটা সংবাদ দিতে ত হবে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের।'

'হাত কাটা গেছে! কোন হাতটা?'

'দেখতেই ত পাচ্ছ, ডান হাতটা'…কথাটা বলেই সার্জন তাহার সহ-কারীদের অস্ত্রোপচারের জন্য সব কিছু ঠিক করে রাখতে বলে দিলেন।

'সর্বনাশ! এ-হাতটা ছাড়া কি করে কাজ-কর্মের ব্যবস্থা করব বলুন দেখি?'

'কি কাজ-কর্মের ব্যবস্থা করবে?'

'কি বলছেন আপনি……কিসের ব্যবস্থা করব? লেখা,—ক্যাম্পে কাজ করা—সংগঠনের কাজ চালান—ফুটবল খেলা। আমি একাই একটা টীম চালাই জানেন?'

'উঃ এই। দেখবে দুদিনেই বাঁ-হাতে লিখতে শিখে যাবে। ফুটবল খেলায় তোমার হাতের প্রয়োজনই হবে না। আর সংগঠনের কাজ সেত মাথার ব্যাপার—বুদ্ধি দিয়ে অন্যকে সাহায্য করবে। এ নিয়ে আর এত ভাববার কি আছে?'

'ঠিকই বলেছেন আপনি'—কোন রকম চিন্তা না করেই ছেলেটি বলে উঠল। কিন্তু একটু পরেই আবার তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'হলে কি হবে মশাই,—সর্বনাশ ত হল। যখনই ভাবি এই আধঘণ্টা আগেও ইচ্ছা করলেই এই দুর্ঘটনাটা না হতে দিতে পারতাম তখনই ভারি অনুশোচনা হয়। শাস্কার জন্যই ত এমনটা হল……সে আমায় কথা দিতে বলল, ঠিক ছ'-টার সময় যেয়ে তাকে রিপোর্ট লিখতে সাহায্য করব। এইবার ঠিকমত সাহায্য করা হয়েছে। মনে করেছিলাম আমার সময়-নিষ্ঠা আর তৎপরতা দেখিয়ে ওদের বিস্মিত করে দেব……ওঃ হো হো উঃ।'

'কি লাগছে খুব?'

'না তেমন লাগছে না। কিন্তু হাতটা যে গেল সেই কথাই ভাবছি, বলেই কনুইর উপর পর্যন্ত কাটা হাতটার দিকে সে একবার চাইতে চেষ্টা করল।

'তুমি ত ভারি শক্ত ছেলে দেখছি, তোমার বাপ-মার মতোই কেমন?'

'বলশেভিকরা সব সময়ই শক্ত। এর সঙ্গে বাপ-মার কোন সম্বন্ধ নেই।' বেশ একটু বিরক্তভাবেই ছেলেটি জবাব দিল। 'মাকে আমার এই অবস্থাটা দেখতে দিতেই আমার যা ভয়।'

'কি বলছ তুমি? এমন শক্ত ছেলে তুমি তবু মাকে এই অবস্থাটা দেখতে দিতে ভয়?'

'ভয়ের কথা হচ্ছে না ঠিক। হাজার হোক মেয়েমানুষ ত সে। মেয়েদের কান্না আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।'

'তুমি কি মনে কর তোমার নিজের কোন দুর্বলতা নেই?'

'সে কথাই হচ্ছে না। ভাবছি এবার সে এলে কি উত্তর দেব তার কথার। আমার এই বেপরোয়া জীবন নিয়ে অনেক ঝগড়া করেছে সে আমার সঙ্গে—কত বিপদের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু কোন কথায়ই কান দিইনি আমি তখন। এতদিন ভাগ্য ভাল ছিল সুতরাং বরাবর বিপদকে এড়িয়ে চলতে পেরেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কথাই ঠিক হল। দুকথা শুনাবার একটা সুযোগ মিলল তার। আমি আহাম্মক, সত্যি একেবারে আহাম্মক। হুঁসিয়ার হয়ে চললে এই আধঘণ্টা আগেও হয়ত ঘটনাটা না ঘটতে দিতে পারতাম।'

অস্ত্রোপচার শেষ হওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে বছর চল্লিশ বয়সের একটি সুন্দরী মহিলা দ্রুত এসে হাসপাতালের করিডরে উপস্থিত হলেন। মহিলাটির মাথায় ধূসর রঙের ছোট্ট একটা টুপি—হাতে কাগজপত্রে ঠাসা বহুদিনের পুরনো একটা ব্যাগ। প্রায় মাটী পর্যন্ত নামান সৈনিকের কোট গায়ে একজন বিরাট চেহারার পুরুষ তার সঙ্গী হয়ে এসেছেন।

মহিলাটির মুখে চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট চোখে পড়ে। অবিশ্যি তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় মনের বিধ্বস্ত ভাবটা চেপে রাখতে চেষ্টা করছিলেন।

ইউনিফর্ম-পরা সঙ্গীটির চেহারা বিরাট হলেও হাবভাবে তাকে নিতান্তই গোবেচারা বলে মনে হচ্ছিল। নিজে পিছনে থেকে মহিলাটির উপরেই সব কিছু ব্যবস্থা করার ভার অর্পণ করে সে নিশ্চিন্ত।

'যে ছেলেটি ট্রাম-চাপা পড়েছে কোথায় সে?' একটি নার্সকে উদ্দেশ্য করে মহিলা প্রশ্ন করলেন। কতকগুলো সন্ত আগত বালিশের ওড় বয়ে নিয়ে নার্সটি তার সামনে দিয়েই চলে যাচ্ছিল। বালিশের ওড়গুলোর কিনার থেকে কতকগুলো সরু ফিতা নীচের দিকে ঝুলছিল।

'এখন যিনি ডিউটিতে আছেন তাকে জিজ্ঞাসা করুন।'…কথাটা বলেই নার্স চলে গেল।

একজন প্রৌঢ়া সিস্টার ওয়ার্ড থেকে মুখ বাড়িয়ে মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বললেন—'ইনিই বোধ হয় ছেলেটির মা, মনে হয়। বহু বছর ধরে এই করছি—যে কোন রকম অস্ত্রোপচারের দৃশ্যও সইতে পারি কিন্তু এখন পর্যন্ত মা'দের কান্নায় অভ্যস্ত হতে পারিনি।' এই সিস্টারটিই ছেলেটির অস্ত্রোপচারের সময় সাহায্য করতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

একজন সার্জন করিডরের উপর দিয়ে পায়চারি করছিলেন। আগত মহিলাটি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনিই কি ডিউটিতে আছেন এখন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আমার ছেলেকে দেখতে চাই—যে ছেলেটি ট্রামে চাপা পড়েছে', মহিলা বললেন। কিন্তু দৃষ্টি তখন তার ডাক্তারের দিকে নয়। ডাক্তারকে ছাড়িয়ে করিডরের উপর দিয়ে তিনি ব্যগ্রভাবে কি যেন খুঁজছিলেন।

'বেঁচে আছে ত সে?'

'আপনি চিন্তা করবেন না মোটেই। সে ভালই আছে।' ডাক্তার উত্তর দিলেন—'কিন্তু আমরা তার কোন আত্মীয়স্বজনকে এ সময় ওকে দেখতে দিতে পারি না। তার এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেয়া দরকার। যে কোন রকম উচ্ছ্বাস বা কান্নাকাটিতেই এখন তার ক্ষতি হবে। তাতে সান্ত্বনা ত সে পাবেই না উপরন্তু তার সেরে ওঠবার সম্ভাবনাও নষ্ট হবে।'

'ডাক্তারবাবু ঠিক কথাই বলেছেন—বুঝলে মাসা',---ইউনিফর্মপরা ভদ্রলোক একটু ইতঃস্তত করে কথাটা বললেন।

'উচ্ছ্বাস, কান্নাকাটি এসব আপনি কি বলছেন। ওসব কিছুই হবে না।' মহিলাটি বললেন—'আমি আমার ছেলেকে কেবল দেখে যাব। তাকে একটা কথা আমাকে বলতেই হবে।'

দর্শনাকাঙ্ক্ষীর দৃঢ় ভাবটা মনঃপূত হয়েছে এমনি ভাবে ডাক্তার তার কাঁধটাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—'বেশ এর একটা সাদা কোট পরে আমার সঙ্গে আসুন। কিন্তু মনে রাখবেন কান্নাকাটি বারণ। সাহস পায়—একটু জোর পায় এমনি কথা আর উৎসাহের এখন তার প্রয়োজন।'

'এ নিয়ে চিন্তা করবেন না আপনি'—বলেই একটা সাদা কোট গায়ে জড়িয়ে মহিলাটি ওয়ার্ডের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললেন—প্যারেডের জন্য সজ্জিত সৈনিকদের পরিদর্শন করতে সেনানায়ক যেমন ভাবে যায়।

ইউনিফর্ম পরিহিত ভদ্রলোকটিও আর একটা সাদা কোট গায়ে জড়িয়ে নিলেন। কিন্তু কোটটা এমনি খাটো যে সেটা গিয়ে তার হাঁটু পর্যন্তও পৌছল না।

মহিলাটি ঘরে ঢুকে ব্যগ্রদৃষ্টি মেলে চারিদিকে তাকাতেই ছেলের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। পরিচিত পায়ের শব্দে ছেলেটিও ঘাড় ফিরিয়ে মহিলাটিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বেশ একটু অপ্রতিভ ভাবেই সে একবার অভ্যর্থনাসূচক হাসি হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু অসম্মানিত ব্যক্তির এগিয়ে দেয়া হাতের মতোই তার হাসি অর্ধ পথেই থেমে গেল—কোনই সহানুভূতি পেল না।

'নিতান্তই আহাম্মক আর বোকা তুমি—' মা বললেন, 'আমি আগেই জানতাম যে এমনি ধরনের একটা কিছু বিপদ হবে তোমার।'

ছেলেটি মার মুখের দিকে তাকাল একবার। তার মুখে চোখে

অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট। তারপর বলল সে—'এইবার অন্ততঃ দোষ দেখিয়ে শাসন করার মতো সৌভাগ্য তোমার হয়েছে। আমিও এমনি ধরনের মন্তব্য শুনব তোমার কাছ হতে আগে থেকেই ধারণা করে রেখেছি। সব চেয়ে দুঃখ হয় এই ভেবে যে, আমি ছেলেমানুষ এইটাই তোমার কাছে প্রমাণিত হয়ে গেল এবার।'

'কেন তোমার কি অন্য রকম ধারণা ছিল নাকি নিজের সম্বন্ধে? লজ্জিত হওয়া উচিত তোমার এ জন্য।'

'নিশ্চয়ই উচিত। তবে এই শেষবার।' ছেলে বলল—'ডাক্তার বলেছেন যে, আমি বাঁ হাতে শীগ্‌গীরই লিখতে শিখে যাব,—সংগঠনের কাজ মাথাতেই চলবে আর ফুটবল—সে ত পা দিয়েই ভাল খেলা যায়। নিজের ভুলের জন্য এতগুলো শাস্তি ভোগ আমি কিছুতেই করব না। ঠিক বলেছি কিনা আপনিই বলুন না মামা?'

'আমার মনে হয় তুমি আবার সব কিছুই ঠিক মতো ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।' ইউনিফর্মপরা ভদ্রলোকটি বেশ সহানুভূতির সুরেই উত্তর দিলেন। 'সুখের বিষয় এই যে, তোমার মাথাটা ঠিক আছে—তা না হলে কি সর্বনাশটাই না হত বল দিকিনি?'

'তোমার বাবাকে কি সংবাদ দেব?' ভাইয়ের সহানুভূতিতে যোগ না দিয়ে আগের মতো নির্লিপ্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন মহিলাটি।

'কি সংবাদ দেবে? আচ্ছা তাকে বলো যে তার আহাম্মক ছেলে তাকে অভিনন্দন পাঠিয়েছে।'

'আর তোমার বোনকে?'

'আমার বোন·········তাকেও বলো বোকা ভাইটি তার অভিনন্দন জানিয়েছে।'

'কাল কেমন থাক দেখতে আসব আবার; আজ আসি।' কথাটা

বলেই মহিলাটি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। করিডরের উপরে এসেই শরীর তাঁর টলতে লাগল। মাথাটা চেপে ধরে তিনি দেয়ালে ভর করে দাঁড়ালেন একবার—পরক্ষণেই চোখ ভেঙে তার অশ্রুর বন্যা নেমে এল।

ইউনিফর্ম-পরিহিত ভদ্রলোকটি তার বোনের অন্তরে এতক্ষণ কি ঝড় চলেছে কিছুই লক্ষ্য করেন নি। 'শীগ্‌গীরই ভাল হয়ে উঠে'—ছেলেটির দিকে চেয়ে তাকে উৎসাহিত করবার জন্য তিনি হাসি মুখে বললেন—'প্রমাণ করা চাই যে কেবল একটা হাত দিয়েই ইউ, এস, এস, আর কে তুমি সাহায্য করতে পার আগের মতোই। কেমন স্বীকার ত?'

'সে নিয়ে চিন্তা করবেন না আপনি'—বিষণ্নভাবে ছেলেটি উত্তর দিল। তারপরই সে কথাটার সঙ্গে যোগ করল—'কিন্তু কি আশ্চর্য এক ফোঁটা চোখের জলও না! এও কি সম্ভব—মার কাছেও আমি এরই মধ্যে…?'

হঠাৎ নীরবে ঠোঁটটাকে দাঁতে চেপে ধরল সে। তার দুচোখ ছাপিয়ে জল উপচে উঠছিল।

অভিনয়

একজনের থাকার পক্ষে ঘরটা অতিরিক্ত রকম বড়। সুতরাং গৃহবাসিনীকে ছোট্ট একটা কোঠা নিয়ে থাকলে যে ভাড়া দিতে হতো এখন তার তিনগুণ ভাড়া দিয়ে সেখানে থাকতে হচ্ছে। তাছাড়া যে কোন সময় হয়ত তাকে অন্য কোন ঘরে উঠে যেতে বলতে পারে,—তা সে নূতন ঘরের আরাম আর সুবিধা এর চেয়ে যত কমই হ'ক না কেন। গৃহবাসিনীর নাম লিসা। কোন্ অফিসে নাকি স্টেনোগ্রাফারের কাজ করে সে। কোন মেয়ে বন্ধুকেও যে সে ঘরের খানিকটা অংশ নিয়ে থাকতে অনুরোধ করবে তারও উপায় নেই। কেননা বাড়ীওয়ালা কিছুতেই তাতে অনুমতি দেবেন না।

বাড়ীটায় এরই মধ্যে অনেকগুলো পরিবার বাসা বেঁধেছে। সুতরাং কোন নূতন লোককে সেখানে আর কিছুতেই নাকি আসতে দেয়া যেতে পারে না।

একদিন লিসার এক বন্ধু কথায় কথায় তার কাছে তার একটি পরিচিত ছেলের কথা উল্লেখ করল। ছেলেটি নাকি থাকবার মতো কোন ঘরের সন্ধান করতে না পেরে শহরের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছে। আর কথা প্রসঙ্গে লিসার সেই বন্ধুটিই প্রস্তাব করল যে, সে যদি ছেলেটিকে বিয়ে করেছে এমনি একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান করতে রাজি হয় তাহলেই ত তার ঘরের অংশীদার জুটে যেতে পারে। তখন আর তাকে ঘরের এত ভাড়াও জোগাতে হবে না, আর কেউ এসে যখন তখন ঘর ছেড়ে দিয়ে তাকে চলে যেতেও বলতে পারবে না।

প্রস্তাবটা লিসার মন্দ লাগল না। সে তখনি বন্ধুর কথায় সম্মত হল।

পরের দিনই একটি শান্তশিষ্ট যুবক তার কাছে এসে উপস্থিত। ছেলেটি হয়তো বা কোনদিন একজন অধ্যাপকও হতে পারে।

'সারা আপনার কাছে কোন প্রস্তাব করেনি?' সে প্রশ্ন করল।

'ধন্যবাদ আপনাকে! হ্যাঁ করেছে।'

'এই ঘরটার কথাই বুঝি সে বলছিল?'

'হ্যাঁ, এই সেই ঘর।'

ছেলেটি চারদিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল। ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পা ফেলে ফেলে মেপে নিল—এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বোধ হয় মনে মনে হিসাব করে দেখল, তারপর প্রশ্ন করল—'তাহলে কবে উঠে আসব এখানে?'

'যেদিন আপনার খুশি। কিন্তু আমার সর্ত জানেন ত?'

'মোটামুটিভাবে জানি············তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। বিয়ে যে হবে সে কি শুধু একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠানেই শেষ হবে না সত্যিকারের বিয়েই হবে?'

'নিতান্তই একটা লোক দেখান অনুষ্ঠান মাত্র'—মেয়েটি উত্তর দিল···'এ ত স্পষ্টই বুঝতে পারেন···।'

'তাহলে আমার পক্ষেও সুবিধা হয়···অবশ্যি সত্যিকারের বিয়ে হলেও প্রয়োজনের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতেই হতো। আজ এখানে কাল ওখানে—এই টানাহেঁচড়ায় সত্যি আমি একেবারে হয়রান হয়ে গেছি।'

'না না নিতান্তই একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। আমার ত একটা পর্দা আছেই—আপনি যদি বলেন তাহলে আর একটা পর্দা টাঙিয়ে সমস্ত ঘরটাকেই আমরা ভাগ করে নিতে পারি। একটা জানালা আমার ভাগে থাকবে আর একটা আপনার ওদিকে।'

'না না অত হাঙ্গামায় কাজ নেই। আমার ত মনে হয় একটা পর্দাই

যথেষ্ট। নইলে অন্য সবার হয়ত সন্দেহ হতে পারে যে আমাদের এ বিয়েটা নিতান্তই একটা অভিনয়।'

যুবকটি বিদায় নিল। তারপর পরের দিনই চলে এল সে সেই ঘরে। জিনিসপত্রের হাঙ্গামা তেমন কিছুই নেই সঙ্গে। কেবল একটা স্যুটকেশ, তাও পুরনো হওয়ায় বিবর্ণ হয়ে গেছে।

'ভাড়া ত আমরা সমান সমানই দেব কি বলেন?'............সে প্রশ্ন করল।

'সেই রকমই ত কথা হয়েছে।'

'বেশ তাই হবে। আমাদের বিয়ে কখন হবে?'

'কাল সকাল বেলা হলেই যেন ভাল হয়। কাজে বেরিয়ে যাবার আগেই রেজিষ্টারি করে আসা যাবে।'

'আমার নাম জানেন ত? বালাশেভ।' ছেলেটি বলল। 'একটা কথা আপনাকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখি'—সে বলে চলল—'আমার ভাবী পত্নী কিন্তু আমার এখানে মাঝে মাঝে আসবে।'

'তা আসবেন বই কি। প্রায় রোজই ত কাজ নিয়ে আমাকে প্রায় মাঝ রাত পর্যন্ত আফিসে ব্যস্ত থাকতে হয়। অতএব অসুবিধা হবে না নিশ্চয়ই আপনাদের।'

'না কোন অসুবিধাই হবে না আমার।'

নকল দম্পতিযুগল এক সঙ্গেই সব ঘরকন্নার বিধি ব্যবস্থা করে নিল। সকাল সন্ধ্যা খাবারও তারা খেত এক সঙ্গেই।

লিসা মেয়ে মানুষ সুতরাং গৃহস্থালির ভার পড়ল তার উপরেই। সকালে উঠেই তরুণী ভার্যার মতো সে প্রাইমাস স্টোভটা জ্বেলে কফি তৈরী করত। বালাশেভ তখন হয়ত ঘরের এক পাশে হাত মুখ ধুচ্ছে।

প্রথম কদিন তাদের দুজনেরই কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকত কিন্তু

দুদিন যেতেই কাজের চাপে এই অবস্থাটাকে আর তাদের অস্বাভাবিক বলে মনে হত না। কোনদিন হয়ত সুটকেশ খুলে একটা ফর্সা তোয়ালে নিতে ছেলেটি ভুলে গেল তখন লিসাই তোয়ালেটা নিয়ে দিয়ে আসত তার হাতে।

দুদিন যেতেই কথাবার্তায়ও তারা আপনি থেকে একেবারে 'তুমির' কোঠায় নেমে এল। এক সঙ্গে থাকতে গেলে এটুকু অন্তরঙ্গতা না হলেই বা চলবে কেন। বিশেষ ভাবে 'তুমিটা' যখন তরুণদের মহলে বেশ সচল। প্রথমটায় পরস্পরকে সম্বোধন করতে তারা নামের আগে মিষ্টার বা মিস্ সংযোগ করত কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও উপসর্গ দুটোর বালাইও তারা কাটিয়ে উঠল। তখন থেকে পরস্পরকে তারা নাম ধরেই ডাকত। তবে বালাশেভের সামনে বিছানায় ঢোকার লজ্জাটা লিসা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

সুতরাং সেই সময়টুকুর জন্য সে বালাশেভকে বাইরে করিডরে পাঠিয়ে দিত। তৃতীয় দিনেই ছেলেটি বলল—'দেখ লিসা, এই অযথা লজ্জার ভানটা ছাড়। ঘরে ত তোমার পর্দাই রয়েছে। ওর পেছনেই ত কাপড়-চোপড় ছাড়তে পার স্বচ্ছন্দে। তবে আর আমার ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন কি? যতবার বিছানায় ঢুকবে ততবারই করিডরে গিয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকি—প্রতিবাসীরা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। বল তো কি বিশ্রী ব্যাপার। অন্য সব লোকেরা ভাবেই বা কি?'

'কিন্তু আমার যে কেমন বাধো বাধো ঠেকে।'

'কি যে বল মাথামুণ্ডু। কেন এতে বাধো বাধোর কি আছে? রেলের কামরায় যাত্রীরা ত কেউ কাউকে লজ্জা করে না। তাছাড়া আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধও ত বন্ধুত্বেরই। অন্য কিছুরই ইঙ্গিত নেই এর মধ্যে। এসব বাদ দিলেও, তুমি ত জান যে, আমার একজন ভাবী পত্নী সশরীরে বর্তমান।

লিসা নির্বিবাদে সঙ্গীর যুক্তির কাছে মাথা নোয়াল। তারপর থেকে বালাশেভ হয়ত টেবিলের সামনে বসে বই পড়ছে,—লিসা তখন পর্দার আড়ালে গিয়ে কাপড়চোপড় ছাড়তে শুরু করল। মাঝে মাঝে দু একটা কথাবার্তাও হয়ত এই সময় তাদের মধ্যে চলত তখন থেকে। লিসা বিছানায় ঢুকে পড়ার পরেও বালাশেভ সোফায় শুয়ে শুয়ে তার সঙ্গে গল্পগুজব করত—ট্রেনের কামরায় দৈবাৎ দেখা হলে যাত্রীরা যেমন পরস্পর কথাবার্তা বলে।

'কেমন কাটছে তোদের?' লিসার এক বন্ধু এক সন্ধ্যায় তার ওখানে বেড়াতে এসে প্রশ্ন করল।

'খুব ভালই কাটছে ভাই'—লিসা উত্তর দিল। 'ভাড়াও এখন কম দিতে হয়, আর তাছাড়া অন্য কেউ এসে যে ঘরটা দাবী করবে সে ভয়ও নেই।'

'সঙ্গীটিকে কেমন লাগছে তোর?'

'সত্যি ভাই ভারি অমায়িক লোকটা। সঙ্গী হিসেবেও চমৎকার।'

'তাহলে তোরা বেশ সুখেই আছিস্ একসঙ্গে?'

'সুখে মানে?'

'কেন—স্বামী আর স্ত্রী সাধারণতঃ যেমন থাকে……'

'না—না—না—সে রকম ধরনের কিছু নয়। সত্যি করেই আমরা ত আর স্বামী স্ত্রী নই। আলাদা ঘরের ভাড়া জোগাতে পারিনি তাই সঙ্গী হিসাবে এক ঘরেই থাকছি। তাছাড়া ওর আবার একজন ভাবী পত্নী আছে যে।'

'বলিস কি? ভাবী পত্নী—'

'সোজা কথায় বলতে গেলে ত তাই বলতে হয়।'

'তোর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, এ অবস্থায় তার ভাবী পত্নী থাকবে কি করে?'

'বেশ, তাতে কি হয়েছে? ডাইভোর্স পাওয়া ত আর খুব কঠিন ব্যাপার নয়। প্রয়োজন হলেই আমরা ডাইভোর্স করব পরস্পরকে। বাস, মিটে গেল।'

'তবে মেয়েটিকে সে এখনো বিয়ে করেনি কেন?'

'ওদের কারোই থাকবার ঘরের সংস্থান নেই তাই।'

'তাহলে এ ব্যাপারে অন্তরঙ্গতা তোদের ঘনিষ্ঠ নয় বলতে চাস্?'

'নিশ্চয়ই—'

'তাহলে সে বোধ হয় তোকে মেয়ে মানুষ বলেই মনে করে না?'

'তোকে ত বললামই তার একজন প্রণয়িনী আছে।'

'তাতে কি হয়েছে'—বন্ধুটি উত্তর দিল। আমি ত এমন ঢের লোককে জানি ভাবী পত্নী থাকা সত্ত্বেও অন্য মেয়ের সম্বন্ধে উৎসুক হতে যাদের মোটেই আটকায় না। অবশ্য সেই মেয়েগুলো যদি আকর্ষণ করার মতো সুন্দরী হয়।'

'না ভাই সে ধরনের লোক এ নয়। তাছাড়া ভদ্রলোক আশ্চর্য রকম কৌশলী। আমার ভাগ্য যে এতটা ভাল হবে এ আমি আশাও করতে পারিনি। লোকটি আদবকায়দাতেও খুব দুরস্ত। তাছাড়া এমন অনেক পুরুষ আছে লজ্জায় যারা মরে থাকে,—এর সে ধরনের ন্যাকা লজ্জাও নেই। এক কথায় সত্যি ভাই ভদ্রলোক বেশ সাদাসিধা—এক সঙ্গে থেকে আরাম আছে। খাওয়া থেকে আরম্ভ করে ঘরকন্নার সব কাজই আমাদের এক সঙ্গেই চলে—অবশ্য ঐ একটা দিক বাদ দিয়ে। তার ভালবাসার ব্যাপারে আমার কোন কৌতূহল নেই আর আমার প্রেমের রাজ্যেও সে মাথা ঢোকায় না। যদিও ভালবাসার আমার কেউ আছে বলে আমি জানি না। এর প্রথম কারণ:—আমি অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত আর দ্বিতীয় কারণ—এই ব্যাপারে বোধহয় আমার রক্ত অতিরিক্ত রকম ঠাণ্ডা।'

'এক ঘরে ঘুমাস অথচ ওদিক দিয়ে পরস্পরের পরিচয় নেই!'

'সত্যি করেই বলছি নেই। ও রকম কোন সম্বন্ধ থাকলে তোর কাছে আর গোপন করব কেন বল?' লিসা উত্তর দিল। 'বিয়েটা যে আমাদের নিতান্তই লোক দেখানো একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র এটা বুঝতে পারছিস না? যাত্রীরা রেলের এক কামরায় ঘুমায় তাই বলেই তাদের ঘনিষ্ঠতা থাকতে হবে নাকি?'

'তোর কথাই ঠিক'—বন্ধুটি একটু ভেবে জবাব দিল। কিন্তু তবু যেন একটা ব্যাপার সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

'তাহলে তার সেই প্রণয়িনীটি বুঝি তোর এখানে আসে? তোর পেয়ালা, তোর বিছানাপত্রও তাহলে সে ব্যবহার করে নিশ্চয়—কেমন?'

'না—না—না'—কেন যেন বেশ একটু শঙ্কিত ভাবেই বলে উঠল লিসা।—'আমার বিছানা স্পর্শও করে না কেউ।'

'সেই মেয়েটিকে দেখেছিস্ কোনদিন?'

'না ভাই এখনো দেখিনি। আর সত্যি বলতে কি তাকে দেখার চেষ্টাও করিনি কোনদিন।'

'তোর অবস্থায় পড়লে আমি কিন্তু কৌতূহল চাপতে পারতাম না। ছেলেটির উপর তার আকর্ষণ কিসের জন্য আর ছেলেটিই বা তার কি দেখে মুগ্ধ হল এ জানতে অন্ততঃ উৎসুক হতাম আমি। আর তুই কিনা এতদিনেও তাকে একবার চোখেও দেখিস্ নি!'

'মেয়েটি কখন আসবে ভদ্রলোক আগে থেকেই আমাকে জানিয়ে রাখে আর আমিও সাধারণতঃ বাড়ী ফেরার আগে টেলিফোনে তাকে জানিয়ে আসি। সুতরাং সেই মেয়েটিকে আমার না দেখাই ত স্বাভাবিক।'

'ভদ্রলোক থিয়েটারে যায় কার সঙ্গে, তোর সঙ্গে না সেই মেয়েটিকে সঙ্গে করে?'

'কেন—সেই মেয়েটিকেই নিয়ে যায়। আমার সঙ্গে যাবে কেন? প্রণয়িনী থাকতে অন্য মেযেব সঙ্গে কেউ আবার কোথাও যায় নাকি? এক ঘরে থাকি—বাস্, সম্বন্ধ ঐখানেই শেষ।'

'আমি আরও মনে মনে কল্পনা কবে এসেছি অন্য রকম'—বন্ধুটি বলল। 'সত্যি ভাই আমি নিরাশ হযেছি।'

'কেন নিবাশ হবার ত কিছু নেই……'

বন্ধুব সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই লিসার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ওলটপালট হয়ে গেল। তার মনে যেন একটা অসোয়াস্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অসোয়াস্তিটা যে কোথায় এবং কেন তাও সে ভেবে কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারছিল না।

আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে নিজেব দিকে চেয়ে দেখল। চুলগুলো তাব যা খাড়া খাড়া, তাও আবার খাটো করে ছাঁটা। চুল কোঁকড়াবাব কলের স্পর্শ ত আর ওদেব গায়ে লাগেনি কোনদিন। আর নাকটা? তার নাকটাকেও ত আর সুন্দর বলা চলে না। তবে হ্যাঁ, মুখের রঙটা তার সুন্দর বইকি।

দরজাটা খুলে তার এক প্রতিবেশিনী ঘরে ঢুকল। 'বাড়ীতে ডিউটি দেবার ভাব এবার তোমার স্বামীর উপর পড়েছে।' অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বলল।

'আচ্ছা সে ফিরে এলে বলব তাকে।'

ঘড়িতে আটটা বেজে গেছে। লিসা আবার ভাল করে চেয়ে দেখল ঘড়িটার দিকে—তাইত আজ এত দেরী হচ্ছে কেন তার? রোজই ত ঠিক ছ'টায় ফিরে আসে। কোথায় যেতে পারে সে?

রাতের খাওয়ার জন্য টেবিলটা ঠিক করে রাখল সে। তারপর নিজের

পেয়ালাটা কি কারণে যেন বার বার গরম জল দিয়ে খুব ভাল করে পরিষ্কার করল।

আজ সন্ধ্যায় তার হাতে কোনই কাজ ছিল না। সেই জন্যই বোধহয় সঙ্গীটির অনুপস্থিতি তার কাছে অমন বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছিল। রাতের খাবারটা দুজনের এক সঙ্গেই খেতে হয় কি না।

'কি স্বার্থপর'—বিরক্তভাবে ঘরময় পায়চারি করতে করতে কথাটা সে নিজেকেই বলল। আমাকে ত একটা সংবাদ পাঠাতে পারতো যে তার দেরী হবে ফিরতে। হঠাৎ তার মাথায় একটা চিন্তা ঢুকল—হয়ত কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রতিদিনই তো লোকজন ট্রাম, মোটর চাপা পড়ে মরছে। কথাটা ভাবতেই সে অসম্ভব রকম ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে তার আফিসে একবার টেলিফোনে সংবাদ নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু কোনই উত্তর নেই। সবাই বোধ হয় অনেক আগেই আফিস ছেড়ে চলে গেছে।

'কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার বলতো'—রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কপালের দুই পাশে আঙুলের ডগাগুলো চাপতে চাপতে কথাটা সে নিজেকেই লক্ষ্য করে বলে উঠল।

সন্ধ্যাটা একলা কাটাতে হয়েছে বলে প্রথমটায় সে বিরক্তই হয়েছিল কিন্তু এখন তার জন্য সে দস্তুর মত শঙ্কিত আর চঞ্চল হয়ে উঠল।

ভদ্রলোক যখন ফিরে এল রাত তখন সাড়ে বারোটা। লিসা একরকম দৌড়েই তার দিকে এগিয়ে গেল। শঙ্কাটা তার তখনো কাটেনি। কিন্তু তাকে সুস্থ ও নিরাপদ দেখে সে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল।

'কি হয়েছিল তোমার? এত রাত ক'রে ফিরলে কেন?' হাত দুটো বুকের উপর সংবদ্ধ করে সে তার সামনে একরকম চেঁচিয়েই উঠল বলা যেতে পারে।

'পথে আমার ভাবী পত্নী মরুসিয়ার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল

—তাই সন্ধ্যাটা দুজনে মিলে একসঙ্গেই কাটালাম'—বালাশেভ উত্তর দিল।

একত্রে সংবদ্ধ হাত দুটোকে মুক্ত করে লিসা মুখ ফিরিয়ে পর্দার অন্তরালে চলে গেল। তারপর এক মিনিটের মধ্যেই কাপড়-চোপড় ছেড়ে একেবারে সোজা বিছানায় গিয়ে ঢুকল। একটা কথা পর্যন্ত বলল না সে বালাশেভের সঙ্গে।

'আমার উপর রাগ করেছ দেখছি। কি, ব্যাপার কি ?' বালাশেভ প্রশ্ন করল। ইচ্ছা না থাকলেও সে যেন নিজেকে কোন অপরাধী বলে মনে করছিল। অন্ততঃ তার গলার স্বর শুনে তাই মনে হল।

লিসা কোনই জবাব দিলনা। শুধু দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে ঠোঁট দুটোকে চেপে দেয়ালের কাগজের উপরকার প্যাটার্নগুলোর দিকে জোর করেই তাকিয়ে রইল।

'বলনা কি হয়েছে ?'

'কি হয়েছে কিছুই জান না ?' পাশ ফিরে শরীরের উপর থেকে কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে সে হঠাৎ বিরক্ত স্বরে বলে উঠল, 'বোঝনা যেন কিছুই। এক ঘরে যার সঙ্গে এক সাথে বাস কর তার দিকে একটু ভদ্রতা ত দেখাতে হয়। প্রণয়িনী নিয়ে আনন্দ করে সময় কাটাবে আর আমি চাবি হাতে করে সারাক্ষণ তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব······'

'লিসা এমন করে অযথা অপমান করোনা আমাকে। তুমি ত জান সে প্রণয়িনী নয় আমার স্ত্রী।'

'ওরে আমার স্ত্রীরে! এতদিন ছিল ভাবী পত্নী আর এর মধ্যেই একেবারে স্ত্রী হয়ে গেছে।' কম্বলটা আবার গায়ের উপর জড়াতে জড়াতে সে চীৎকার করে বলে উঠল কথাটা।

'তোমাদের সম্বন্ধের ফিরিস্তি শোনার আমার দরকার নেই। যে সর্তে

এখান আছ সেটুকু অন্ততঃ মেনে চলবে এই আমি চাই। যার সঙ্গে খুশি জাহান্নামে যাও, আমার তাতে কি! কিন্তু আবার বলে রাখছি—ভদ্রতা-জ্ঞানটা অন্ততঃ একটু রেখো। তা নইলে তোমার সময় ত বেশ আনন্দেই কাটে—আর আমি,—আমি ঘরে এসে প্রতীক্ষায় বসে থাকি তোমার পথ চেয়ে।'

'আমার সময় মোটেই আনন্দে কাটে না লিসা। তুমি ত জান আমরা দু'জনে কি দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছি—দুঃস্বপ্নেও বলতে পার। তার সঙ্গে দেখা হলেই সেদিন কি যে নাজেহাল হতে হয় আমাকে, তা তুমি হয়ত কল্পনাও করতে পারবে না। তাকে কত রকমে বোঝাই যে এখানে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের মধ্যে সত্যি করেই আপত্তিকর কিছুই নেই—এ আমাদের একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। আমি অবশ্য জানতাম আজ সন্ধ্যায় তোমার হাতে কোন কাজ নেই ঘরেই থাকবে, তাই তোমাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছা হল না। সুতরাং মরুসিয়াকে নিয়ে সিনেমায় চলে গেলাম। অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য আমাদের একটু একত্রে থাকবার সুযোগ হবে সেখানে এই ভরসায়। তা'ছাড়া দুজনে সেখানে বসে প্রাণ খুলে একটু কথাবার্তাও বলতে পারব। তিন তিনটা প্রোগ্রাম আমরা সেখানেই কাটিয়েছি। এক একটা প্রোগ্রাম শেষ হয় আর বেরিয়ে এসে নূতন টিকিট কিনে আবার ভিতরে ঢুকি।'

সেদিন থেকেই তাদের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যে কোথায় যেন একটু চিড় ধরেছে। লিসা বলবার মত কোন কথা যেন আর খুঁজে পায় না—মেজাজ খিট্‌খিটে হয়েই আছে। আর বালাশেভও ভয়ে ভয়ে কোন রকমে দিন কাটায়। তার ভাব দেখে মনে হয়—সে যেন প্রতিপদেই লিসার বাক্যবাণের ভয়ে শঙ্কিত।

লিসার অবশ্য সেদিক দিয়ে কোন কুসংস্কার নেই। তবুও সে সহজ হতে পারে না। অবোধ্য একটা বেদনা গোপন কাঁটার মত তার মনে সব সময়ই খচ খচ করে। যখনই সে ভাবে—আইনতঃ যে সবকিছুর অধিকারী সেই মূকের মত দূরে দাঁড়িয়ে আছে,—আর ওরা বোধ হয় মনে মনে স্বপ্ন দেখছে যে, কোন রকমে লিসা যদি অন্তর্ধান করে তবে কি রকম সুখীই না তারা হবে। তখন সেই 'অন্যটিকে' এখানে নিয়ে আসার আর কোন অসুবিধাই থাকবে না তার।

একদিন বালাশেভ মরুসিয়ার জন্য একটা পেযালা কিনে এনে তাদের বাসনপত্র যেখানটায় থাকত সেই তাকের উপর রেখে দিল। লিসার কাছে কেন যেন এটা ভয়ংকর অপমানজনক বলে মনে হল।

'এ সব কি হচ্ছে?' নিজের মনেই ভাবল লিসা—'এরই মধ্যে তাঁদের জিনিসপত্র সব একত্র করা হচ্ছে—আর তা নাকি আমার এই তাকটার উপর।'

একদিন এক প্রতিবেশী বেশ একটু সহানুভূতি নিয়ে এসেই বলল লিসাকে—'দেখ, তুমি যখন বাড়ী থাক না,—কে একজন মেয়ে যেন তোমার স্বামীর কাছে প্রায়ই আসে। জান তুমি মেয়েটি কে?'

'জানি বই কি,' একটু রুষ্টভাবেই জবাব দিল লিসা। 'ওর বোন হয়—আমার সঙ্গে ভাব নেই মোটেই তাই আমার অনুপস্থিতির সুযোগে ওকে দেখতে আসে।'

লিসার পরিচিত মহলে কেমন যেন একটা খটকা লাগল। তারা প্রায়ই দেখে লিসার পরিবর্তে সেই অন্য মেয়েটিকে সঙ্গে করে বালাশেভ থিয়েটারে যায়। অথচ লিসা বসে থাকে একলা বাড়ীতে।

তার সঙ্গে থিয়েটারে যাওয়ার প্রয়োজনই অনুভব করেনি লিসা কোনদিন—আর গেলেও লিসা নিশ্চয়ই সুখী হত না। কিন্তু লোক দেখাবার জন্যও

ত অন্ততঃ সে তাকে একদিন নিয়ে যেতে পারত সেখানে। এটুকু বিবেচনা অন্ততঃ তার থাকা উচিত ছিল। লিসা ভাবল—তাকে নিয়ে যাবে কেন? এতো স্পষ্টই বোঝা যায়, সন্ধ্যাগুলো সেই 'অন্যটিকে' নিয়ে কাটাবার জন্যই সে বহু যত্নে জমিয়ে রাখে। লিসাকে থিয়েটারে নিয়ে গেলে সেই সোহাগিনী পাছে তাদের দেখে ফেলে সে ভয়ও ত আছে। এবং লিসাকে এড়িয়ে চলার এইটাই বোধহয় কারণ……

'তাছাড়া দুজনে সেখানে একটু প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে পারব' বালাশেভের সেদিনের এই কথাটা আজো কাঁটার মতো বিঁধে আছে লিসার মনে। কথাটা মনে হলেই কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করে সে।

এ তো স্পষ্ট যে তার কাছে লিসার কোন অস্তিত্ব নেই…সেই 'অন্যটির' সঙ্গেই মাত্র সে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে! দেখতে না জানি কেমন মাগী! আর তার আকর্ষণ করার অস্ত্রটাই বা কি? এমন করে ভুলালো কি করে সে এই ভদ্রলোককে!

সেই মেয়েটাকে দেখবার একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লিসাকে পেয়ে বসল এবং শেষ পর্যন্ত দেখলেও সে তাকে। এমন অসাধারণ কিছুই নয়। সাধারণতঃ মেয়েমানুষ যা হয় তাই। চুলগুলো কোঁকড়ান,—সাধারণ গড়ন,—ঠোঁটে রঙ মাখে,—ঠাটঠমকও তেমন দেখা গেল না কিছু—নিতান্তই নিরীহ—শান্তশিষ্ট। তা ছাড়া বয়সও ত নেহাৎ কম নয়।

বালাশেভ তার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে পথ চলতে চলতে খুব উৎসাহের সঙ্গে কি যেন গল্প করছিল। মেয়েটা তার গায়ের সঙ্গে লেগে মাঝে মাঝে নীরবে চোখ তুলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসছিল। দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে তার কথার সঙ্গে মেয়েটার হাসির কোনই সম্বন্ধ নেই, এতগুলো লোকের ভিড় ঠেলে এমন গায়ে গা লাগিয়ে চলতে পারছে বলেই যেন হাসিটা তার ভিতর থেকে চল্‌কে বেরিয়ে আসছে।

'কি নচ্ছার', লিসা নিজের মনেই বলল। 'হ্যাঁ, বুঝতাম তবু যদি মাগী তেমন সুন্দরী হত। কিন্তু ঐতো রূপ—না আছে রঙ আর না আছে ঢঙ। এখন ত সব স্পষ্ট হয়ে গেছে। এর পরেও আমার কাছ থেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ছাড়া আর কোন কিছু আশা করা উচিত কি ভদ্রলোকের। লোকটার উপর সত্যি একটা শ্রদ্ধা জন্মেছিল আমার।'

'আমি যখন বাড়ী থাকি না', লিসা ভাবল—'ঐ নচ্ছার মাগী আমার ঘরে বসে বসে আমার পেয়ালায় চা গেলে আর আরাম করে। বলতো আমার জীবনের উপর কি অন্যায় পদক্ষেপ। আমি কারোর কিছুতে মাথা ঢোকাই না আর কিছু করি।

সপ্তাহে তিনটা দিন লিসাকে কাজ নিয়ে ভয়ংকর ব্যস্ত থাকতে হয়। সুতরাং ঐ কটি দিন সারাটা সন্ধ্যা সে আফিসেই কাটিয়ে আসে। এই সময় ভাবী পত্নীকে অভ্যর্থনা করতে বালাশেভের কোনই বাধা ঘটে না। আগে সে কোন রকমে কেবল লিসাকে জানিয়ে রাখতো আজ সে আসছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আফিস ছাড়ার আগে লিসা যেন তাকে জানিয়ে দেয় কখন সে ফিরছে বাসায়।

লিসাও বেশ শান্তভাবেই জবাব দিত। কিন্তু তাদের সেদিনের কথাবার্তার পর থেকে সে কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়েছে। সেই মেয়েটির নাম শুনলেই তার শরীরে কেমন যেন জ্বালা ধরে যায়। বালাশেভও আর আগের মতো করে সহজভাবে তার ভাবী পত্নীর কথা উল্লেখ করতে পারে না লিসার কাছে। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। লিসা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল—এই ঘটনার আগের দিনও লোকটা ভারি অমায়িক আর বিনীত ছিল—কিন্তু তারপর থেকে মিষ্ট কথায় সে কেবল লিসাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। এতে লিসার সারাটা শরীর যেন জ্বলে গেল। বিশেষ করে তার যখন মনে হয়—এই অমায়িক ব্যবহার আর

মিষ্টি কথার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে—তাকে কোন রকমে হাতে রাখতে চায় সে।

এর পরের ঘটনা। একদিন হঠাৎ লিসার উপর বালাশেভের ভারি দরদ দেখা গেল। এমনকি সে কতকগুলো ফুল পর্যন্ত নিয়ে এল লিসার জন্য। লিসা অন্তরে সুখী হলেও বিস্মিত না হয়ে পারল না। কিন্তু মনের কথাটা ব্যক্ত করার যেন আর তর সইছিল না বালাশেভের। সে চট করে কথাটা প্রকাশ করে ফেলল—'আজ সন্ধ্যায় অবসর থাকবে তোমার ?'

'হ্যাঁ'।

'বাড়ীতেই থাকবে—না অন্য কোথাও বেরোবে ?'

এতক্ষণে লিসা ফুলের অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল। সে উত্তর দিল বিরক্ত ভাবে—'নিশ্চয়ই বাড়ী থাকব। অসুস্থ হলে অন্ততঃ নিজের ঘরের উপর আমার একটু দাবী নিশ্চয়ই আছে। শরীরটা আজ আমার মোটেই সুস্থ নয়—আজ আর কোথাও বেরোবার উপায় নেই আমার।'

'আমি ত আর জোর করে তোমাকে বাইরে পাঠাচ্ছি না। কেবল জিজ্ঞাসা করেছি যে তুমি···' বেশ একটু বিচলিত ভাবেই বলল বালাশেভ! '—না—তার দরকার নেই আমি নিজেই বাইরে যাচ্ছি আজ।'

'সিনেমায় যাচ্ছ নিশ্চয়ই'—লিসা তার পিছনে কথাটাকে ছুঁড়ে মারল—'প্রাণ খুলে দুজনে যাতে কথা বলার সুযোগ পাও তার জন্য, নয় ? ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক তোমার উপর।'

বালাশেভ নিরুত্তরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল। বেগে চলে যাওয়ার সময় দরজায় লিসার এক বন্ধুর সঙ্গে লাগল এক ধাক্কা।

'হয়েছে কি তোর ?' লিসার বিপর্যস্ত চেহারা লক্ষ্য করে তার বন্ধু প্রশ্ন করল।

'কি আর হবে…জীবন একেবারে দুর্বহ হয়ে উঠেছে।'

উত্তর দিল লিসা—'এরই মধ্যে ওদের জিনিসপত্র সব সাজানো-গুছানো আরম্ভ হয়ে গেছে। ঐ দেখনা 'প্রণয়িনীর' পেয়ালাটা পর্যন্ত আমার তাক দখল করেছে। সেই নচ্ছার মাগীটাকে নিয়ে ও থিয়েটারে যায়…আর তাকে খুশি করার জন্য সে কত রকম ফিকিরফন্দি! লোকের কাছে আমার অবস্থাটা কি রকম হাস্যাস্পদ হয়েছে বল দেখি।

'হ্যাঁ—তাও যদি বুঝতাম ছিনালটার তেমন চোখ ধাঁধানো রূপ থাকতো। সে ছাইও নেই। তাছাড়া মাগী ওর চেয়ে বয়সে বড়ই হবে।'

'তাতে তোর কি?' বন্ধু জবাব দিল, 'সে তোর আত্মীয়স্বজন, না কেউ! দু'রাতের অতিথি—এক ঘরে আছিস এই যা। কালই হয়ত চলে যেতে পারে।'

'বলিস কি কালই? কেউ বলেছে বুঝি তোকে?' লিসা বেশ শঙ্কিত ভাবেই প্রশ্ন করল।

'বলবে আবার কে। যে কোন সময় এখান থেকে চলে যেতে পারে তাই বলছি।'

কথাটা লিসার মনে বেশ একটা নাড়া দিল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল সে—'যায় যাক্…তার যা খুশি করুক। আমার পক্ষে সত্যি ভাই অসহ্য হয়ে উঠেছে। কিছুদিন থেকেই লোকটাকে দুচোকে দেখতে পারি না। যেদিন থেকে বুঝেছি যে মেয়েদের ব্যক্তিত্ব,—আত্মবিশ্বাস ওর চোখে কিছুই নয়—সেদিন থেকেই ওর উপর থেকে আমার শ্রদ্ধা ঘুচে গেছে। নরনারীর মিলনের মধ্যে যে একটা তাৎপর্য রয়েছে তা পর্যন্ত ওর বোঝবার ক্ষমতা নেই। মেয়েমানুষ হলেই ওর হল—তা সে যে কোন রকম মেয়েই হক না কেন। সেদিন যখন সেই মাগীটার সঙ্গে পথ দিয়ে যাচ্ছিল ওর সে কি ন্যাকামি; পারলে যেন পায়ে গড়িয়ে পড়ে। কথাটা মনে হলেই আজও

আমার ঘেন্না করে। এমন মশগুল হয়ে পথ চলছিল যে আমার পাশ দিয়ে গেল তবু তার চোখেই পড়লাম না আমি।'

'তোকে দেখেও ত না দেখার ভান করতে পারে।'

লিসা দাঁত দিয়ে ঠোঁটটাকে চেপে ধরল।

'তুই কি মনে করিস সেই ছিনালটার সামনে আমাকে চিনলেই লজ্জিত হয়ে পড়ত সে।'

'কি করে বলব ভাই—তাও হতে পারে'--বন্ধুটি জবাব দিল।

লিসা নিরুত্তর। চোখ দুটোকে সংকুচিত করে সে খানিকক্ষণ সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ সে রীতিমত খেঁকিয়ে উঠল!—'আমার বন্ধুরা প্রায়ই এসে আমাকে বলে যে অ্যাণ্ড্রিকে তারা আর একটি মেয়ের সঙ্গে দেখেছে। আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করি—সে ওর বোন হয়। কিন্তু অতি বড় আহাম্মকও তাকে দেখলে বুঝতে পারে কি ধরনের বোন সে। আমার দুরবস্থাটার কথা একবার চিন্তা করে দেখ দেখি। কি হাস্যাস্পদ আর অপমানকর ব্যাপার। আইনতঃ সব কিছুর অধিকারিণী হলাম আমি আর সবাই দেখে বিয়ের পরদিন থেকেই সে অন্য একটা মেয়েকে আমার ঘরে টেনে নিয়ে আসে! আমার অবস্থাটা তখন কেমন হয়? আর লোকজনই বা আমাকে দেখে কি ভাবে, বুঝতে পারিস্? তাছাড়া সপ্তাহে তিন দিনেও তার সখ মিটে না—যে সন্ধ্যাটায় অবসর থাকি সে সন্ধ্যাটায়ও তার বেরোনো চাই। তাকে নিয়ে একদিন সিনেমায় না গেলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। এর কারণ জানিস? সিনেমায় গেলে নাকি দুজনে প্রাণ খুলে একটু কথা বলবার সুযোগ পায়। আমার সঙ্গে কথা বলে ত আর প্রাণ ভরে না, বুঝলি ত ব্যাপারটা। ওর কথা বুঝতে পারার মতো বিদ্যাবুদ্ধিও কি আমার মধ্যে নেই। আমার চেয়ে ওর চোখে সেই মাগী হল বেশী বিদুষী, বুদ্ধিমতী—সুন্দরীও নিশ্চয়ই।'

'এ ত ভাই অস্বাভাবিক মোটেই নয়। যে যাকে ভালবাসে তার সঙ্গে সে প্রাণ খুলে কথা বলতে চাইবেই।'

'তুই জানিস না তাই একথা বলছিস্। সে মাগী একেবারে নিরেট আহাম্মক—অতি সাধারণ। তবু তার সঙ্গে অত কথা বলবার কি থাকতে পারে ওর। একদিন কথা বললেই ত যথেষ্ট। আর আমি—আমি হলাম ওর চোখে নিতান্তই নগণ্য—ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করারও যোগ্যা নই। আমার সঙ্গে একটা সন্ধ্যা কাটানও ওর পক্ষে অসম্ভব।'

'তোকে ত বলেছিই যে কোন পুরুষ যখন কোন মেয়েকে ভালবাসে তখন এইরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই সামান্য কথাটা তোর বোঝা উচিত······'

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অ্যাণ্ড্রির পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। সারাদিন-রাত্রিতেও লিসা তার সঙ্গে একটিও কথা বলে না। খাবার সময়ও সে আর এখন অপেক্ষা করে না তার জন্য—তাকে বাদ দিয়েই সে তার নিজের খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়।

তার ভাবী পত্নীর আসার সম্ভাবনা থাকলেই লিসার হাতে আর কোন কাজ থাকে না—সারাটা সন্ধ্যাই ঘরে বসে কাটিয়ে দেয় সে। বাধ্য হয়ে অ্যাণ্ড্রিকেই বাইরে বেরোতে হয়। কিন্তু যেই সে বেরিয়ে যায় অমনি লিসাও উঠে বেরিয়ে পড়ে বন্ধুদের বাড়ী টহল দিতে। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত আর তার ঘরে ফেরবার নাম নেই। যে কোন অজুহাতেই হোক সে সহস্র রকমে চেষ্টা করে অ্যাণ্ড্রির সঙ্গে সেই মেয়েটির দেখাশোনায় বিঘ্ন ঘটাতে।

বিছানায় ঢুকতে কিংবা বিছানা ছেড়ে বেরুতে সে অ্যাণ্ড্রিকে আবার বাইরে পাঠাতে শুরু করেছে। আগে অ্যাণ্ড্রি তার সামনেই জামা কাপড় ছাড়ত, গা ধুইত। বল্‌তে কি এসব লিসার ভালই লাগত তখন—কিন্তু

এখন এতে ভয়ঙ্কর আপত্তি তার। একটা অপরিচিত পুরুষের এতটা নির্লজ্জতা বরদাস্ত করতে সে মোটেই প্রস্তুত নয়।

হঠাৎ মেজাজটাও যেন কেমন তার ভারি খিটখিটে হয়ে গেছে। অ্যান্ড্রির সঙ্গে ভাল করে কথা বলা ত দূরের কথা তার নামের উল্লেখ পর্যন্ত তার কাছে অসহ্য। তার মুখে চোখে সব সময়ই একটা বিরক্তির চিহ্ন লেগেই আছে।

'আমার এঘর ছেড়ে যেখানে খুশি চলে যেতে পার তুমি, আমার এখানে এসব চলবে না'—অনেক রাতে ঘরে ফিরতেই অ্যান্ড্রিকে উদ্দেশ করে বলে উঠল লিসা। 'তোমার সব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে দিন-দিনই আমি জড়িয়ে পড়ছি। আমার মুখের উপরেই এখন মানুষ যা তা বলে উপহাস করে।'

'কিন্তু কোথায় যাব?' অ্যান্ড্রি উত্তর দিল। 'তুমি ত আমার অবস্থা জানই। এখান থেকে যেতে পারলে খুশিই হতাম, কিন্তু যাই কোথায়?'

'খুশি ত হবেই—আমার সান্নিধ্য তোমার ভাল না লাগারই কথা।'

'আমি কিন্তু সে মনে করে বলিনি—'

'কি মনে করে বলেছ সে আর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না, সে আমি বুঝি। সে যাক্—দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে তুমি গেলেই আমি খুশি হব কেননা ব্যাপারটা ক্রমশঃই হাস্যাস্পদ হয়ে উঠছে—। এ অভিনয়ের শেষ হওয়াই ভাল।'

পরের দিন অ্যান্ড্রি একরকম দৌড়েই এসে ঘরে ঢুকল। চোখে মুখে তার আনন্দের আভাস সুস্পষ্ট। উল্লাসে সে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল :—'যা হোক পেয়েছে—শেষ পর্যন্ত সে একটা খোঁজ পেয়েছে।'

'কে কি খোঁজ পেল?' বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন করল লিসা। হঠাৎ মুখ তার কেন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল।

'অনেক খুঁজে খুঁজে মরুসিয়া একটা ঘরের জোগাড় করেছে। আমার সান্নিধ্য থেকে তোমাকে অব্যাহতি দিয়ে এবার তার সঙ্গে বাস করতে চললাম! ডাইভোর্স নেয়াটা ত আর তেমন শক্ত কিছুই নয়—দু এক মিনিটের ব্যাপার মাত্র। রেজিস্ট্রারকে এই বলে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিলেই চলবে:—'আজ থেকে এই নামের মেয়েটি অমুক ঠিকানার, আর আমার স্ত্রী বলে গণ্য৷ হবে না।' কষ্ট করে তোমাকে রেজেস্টারী অফিসে না দৌড়ালেও চলবে।'

কথাগুলো শেষ করেই তাড়াতাড়ি সে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে দিল। তার দিকে লিসা নীরবে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। তার চোখে মুখে ঔদাসীন্যের ছায়া ঘনীভূত,—হাত দুটো দুপাশে দোদুল্যমান। কি হচ্ছে কিছুই যেন বুঝতে পারছিল না সে। হঠাৎ আলনাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বেশ শান্ত ভাবেই বলল লিসা—'দেখো তোয়ালেটা তোমার যেন ভুলে রেখে যেওনা।' তোয়ালেটা নিজেই টেনে নিয়ে সে অ্যাণ্ড্রির দিকে এগিয়ে দিল।

'ব্রাশগুলো···সাবানটাও নিও মনে করে'—আবার বলল লিসা। তারপর ব্রাশ, সাবান, টুথপাউডার একটার পর একটা সে মেঝের উপর অ্যাণ্ড্রির দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত লিসা তাকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে অ্যাণ্ড্রির ভাবী পত্নীর পেয়ালাটা তুলে নিয়ে সে তার পায়ের কাছে আছড়িয়ে ফেলে দিল। কাচের পেয়ালা মেঝের উপর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। তারপর সে চীৎকার করে বলে উঠল—'দেখো তোমার কোন জিনিসপত্র যেন এখানে পড়ে না থাকে।'

কথাটা শেষ হতেই বিছানার উপর আছড়ে পড়ে বালিশে মুখ ডুবিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে শুরু করল। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে

চেপে রাখবার ক্ষমতা হল না তার। তার কান্নার ফাঁকে ফাঁকে মাত্র এই কটি কথা বেরিয়ে এল—

'আজ থেকে এই নামের মেয়েটি আর আমার স্ত্রী বলে গণ্যা হবে না।'

বৃহৎ পরিবার

"বন্ধু ভারুচা, আবার বসন্ত এল। তোমাকে সেই বেপরোয়া চিঠিখানা লেখার পর পূর্ণ একটা বছর গড়িয়ে গেছে। এতদিন নীরব ছিলাম, কেননা ভিতর থেকে কোন তাগিদ পাচ্ছিলাম না তোমাকে চিঠি লেখার। মনের অবস্থাটা ভাল ছিল না। সেও হয়ত চিঠি না লেখার একটা কারণ হতে পারে।

গত সপ্তাহে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, তাই আজ তোমাকে লিখতে বসেছি। তোমাকে একটি ছাত্রের কথা লিখেছিলাম বোধহয় মনে পড়ে। আমার মধ্যে হৃদয় খোঁজার যে প্রবৃত্তি সে জাগিয়েছিল, সে কথাও আশা করি ভোলনি। যাক,—গত সপ্তাহে আবার তার সঙ্গে দেখা—গেল বসন্তে গ্র্যাজুয়েট হয়ে সে ব্যবসা শুরু করেছে। তাই এত দীর্ঘ দিন সাক্ষাতের কোন সুযোগ হয়নি আমাদের।

একটি শিশু আমার জীবনে আজ মস্ত বড় একটা অভিনবত্ব ঘটিয়েছে। আমি মা হয়েছি। শিশুটির বয়স এই সবেমাত্র তিন মাস। সংবাদটা তোমার কাছে অদ্ভুত শোনাচ্ছে কি? এই মাসের শেষেই আমার ক্লিনিকের কাজ শেষ হবে। তখন থেকে আমি স্বাধীন কিন্তু গত বছরের অভিজ্ঞতায়

আমি যেন সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ হয়ে গেছি। এই অভিজ্ঞতাব সূচনা কখন থেকে জান? যেদিন আমি প্রথম বুঝলাম আমি মা হ'তে চলেছি। সেদিনটার স্মৃতি আজও আমার চোখে ভয়াবহ। প্রথমেই মনে হলো: বাড়ীর সবাই আমাকে এই অবস্থায় দেখে কত কিই না ভাববে। তাদের চোখে এর চেয়ে লজ্জাকব অবস্থা আর কি হতে পারে? তার উপর পাড়া-পড়শীর বাঁকা চাউনি, ফিস্‌ ফিস আব কানাকানির কি অন্ত থাকবে? আমাকে লক্ষ্য করে কত অভিশাপই না দেবে তাবা—আমাব এই স্বাধীন জীবনকে লক্ষ্য করে, স্বাধীনতা আমাকে সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট করেছে বলে। গতানুগতিক ধারায় বাজাবে দুধ না বেচে মস্কোতে শিক্ষা লাভ করেছি, এও হয়ত তাদেব অভিশাপেব একটা কারণ হতে পারে।

ট্রেনের ক্লান্তিকর ভিড়ের মধ্য থেকে ভোবেব দিকে একটা গ্রাম্য গাড়ীতে এসে উঠলাম। মনে হ'ল সব ব্যথা যেন আমার মুছে গেছে।

সারা রাতের ভ্যাপসা গবম আর ঠেলাঠেলিব ভিড় থেকে জুনের ঝলমলে প্রভাতের মধ্যে নেমে আসা ভাবি তৃপ্তিকর। এই অনুভূতিব সঙ্গে পরিচয় হয়ত তোমাবো আছে।—বৃষ্টি-ভেজা কচিপাতার শ্যামলিমায় চাবদিক নিথর …মেঘলা নরম আকাশ · দৃষ্টির বাইরে কোথায় যেন একটা পাখী ডাকৃছে ·· মাঠ-ভরা যবেব লম্বা গাছগুলো দিগন্ত পযন্ত বিস্তৃত।

হেজেল গাছেব ডাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে গাড়ীখানা যখন আমাদের এগিয়ে যাচ্ছিল, বড় বড় বৃষ্টিব ফোঁটা এসে লাগছিল আমাদেব চোখেমুখে। ছোট পথের বুক বেয়ে বার্চ গাছের উগ্রগন্ধ নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে উঠেছে। প্রভাতের এই মধুর মাধুর্য, চারিদিকের এই তকতকে আবহাওয়া, সীমাহীন রাইক্ষেতের অপূর্ব শ্যামলিমা, সবই যেন আমার অন্তরেব সঙ্গে সংযুক্ত; অন্ততঃ আমার তাই মনে হচ্ছিল।

এমনি সব মধুর চিন্তায় মন ভরে বাড়ীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। দূর

থেকেও ছোট্ট বাড়ীর ছাদটা চোখে পড়ল,—বাড়ীর সামনেকার বুড়ো রাউন গাছের চূড়াটাও। মনে হল আবার যেন শৈশবের বুকে ফিরে চলেছি।

গ্রামে এসে পৌঁছতেই চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। খুশির বন্যায় প্রাণ আমার কানায় কানায় ভরে উঠছিল।

আমরা তখন সদর রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। পথের দুই পাশে ঘাস আর নেট্‌ল আর—সিলেন্‌ডাইনের ভিড়।

কুয়োর দিকে যে ভাঙা রাস্তাটা এগিয়ে গেছে সেটাকেও দেখলাম। পথটার দিকে চেয়ে দেখতেই ছোটবেলাকার হাজার স্মৃতির টুকরো চোখের সামনে ঝলমলিয়ে উঠ্‌ল। ঠিক সেই মুহূর্তেই মেঘের আবছা কাটিয়ে সূর্য তার প্রভাত আলোর স্পর্শে গ্রামগুলোকে আদর জানাল। গ্রাম্য পথের ধারে ধারে ঘাসের শীষে জমাট-বাঁধা বৃষ্টির দানাগুলোতে সূর্যের আলো ঝিল-মিল করছিল।

হঠাৎ একটি তরুণীর উপর আমার চোখ পড়ল। মেয়েটিকে আমি চিনতাম। কর্মকারের বউ সে। খুশির আতিশয্যে তাকে প্রায় অভিনন্দন জানাতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু মুচকি হেসে মেয়েটি তাড়াতাড়ি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ওর হাসির ভঙ্গিতে কেমন যেন একটা উপহাসের আভাস পেলাম।

এই মুখ ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় তোমারো আছে কি? এর অর্থ জান? এর অর্থ অনেক সময়ই বোঝা যায় না। সাধারণের ভিড় ঠেলে হঠাৎ কেউ বড় হয়ে উঠলে তার বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে—ঘৃণা আর হিংসা। এই হাসিটুকুর মধ্যে সেই হিংসারই আভাস পেলাম। এমনি ধারা দৃষ্টি মেলে কেউ যখন তোমার দিকে তাকায়—মন কেমন যেন সংকুচিত হয়ে যায়। বহু চেষ্টা করেও সেই সংকোচের কারণ তুমি আবিষ্কার করতে পার না।

হঠাৎ নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ে গেল,—বরং বলা উচিত নিজের তৎকালীন অবস্থাটা আমায় কাঁটার মতো বিঁধল .....

শেষ পর্যন্ত বাড়ীতে এসে পৌঁছে গেলাম। ছোট্ট বাড়ী—তিনটি মোটে জানালা---চারদিক মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। মুরগীর ছানারা এখানে ওখানে অনেকগুলো গর্ত খুঁড়েছে। উঠানের উপর দৃষ্টি পড়তেই একটা তলখসা ভাঙ্গা বালতির উপর চোখ পড়ল। পিছনের দরজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা কতকগুলো সাবানের ফেনাও দেখলাম। হঠাৎ কৃষক জীবনের নিরুপায় অবস্থার কথা মনে পড়ে গেল। বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক জীবন যাত্রা! দশ পনর বছর আগে দেখলেও এই সাবানের ফেনা আর ছেঁড়া ন্যাকড়াই দেখতে পেতে।

মা কিন্তু আমাকে প্রথমেই দেখতে পাননি। আমার দিকে পিছন ফিরে তখন তিনি ষ্টোভের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পরনের স্কার্টটা ভয়ংকর রকম বিশ্রী আর নোংরা। তাঁর সবল হাতে একটা বালতি ঝোলান ছিল।

আমার দিকে চোখ পড়তেই বালতিটা তিনি মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। আনন্দে হাত দুটো তাঁর একত্র সংবদ্ধ হয়ে গেল।

এই এক মিনিট আগেও বাড়ীর দিকে ফিরতে উৎসাহের আমার অন্ত ছিল না,—মনে হচ্ছিল সময় যেন আর কাটে না। কিন্তু বাড়ী পৌঁছতেই কেন যেন আমার সব আনন্দ উবে গেল। মাকে চুমু খাবার সময় অনুভব করলাম: যেন একখানা ছুরি উঁচিয়ে রেখেছি আমি আমার পিছনে।

বহুদিন কারো সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করেছ—সে হয়ত ভাল করে লক্ষ্যও করেনি কোন দিন তোমাকে,—তবু তার কাছ থেকে তোমার অবস্থা গোপন রাখতে পার কি? এক সপ্তাহ না পেরোতেই মা আমার দিকে বাঁকা চোখে চাইতে শুরু করলেন। মনে যে তাঁর সন্দেহ আর আশঙ্কার ছায়া দুলছে তা তাঁর গোপন চাউনি দেখেই বুঝতে পারলাম।

কখনও হয়ত বা আনমনে জানালার পাশে এসে দাঁড়াই কিংবা কখনও হয়ত বা বসে থাকতে থাকতে কোন একটা কিছুর উপর দৃষ্টি স্থির করে রাখি। মা সেই ফাঁকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তার দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা আর ভয়। তাঁর চোখে চোখ পড়তেই তিনি এমন একটা ভাব দেখান যেন কোন একটা কিছু খুঁজছিলেন তিনি। তারপর হঠাৎ চলে যান সেখান থেকে। তাঁর সতর্ক দীর্ঘ-নিশ্বাস কিন্তু আমার লক্ষ্য এড়াতে পারে না।

বাড়ী পৌঁছবার প্রায় দিন পনের পরের কথা। কোথায় বেরোবেন বলে হঠাৎ মা একদিন তাঁর সাদা রুমালটা মাথায় জড়িয়ে নিলেন। আমার পাশ ঘেঁষে বসে অনেক কথাই সেদিন তিনি বললেন আমাকে। বয়স যে আমার পঁচিশ পেরোতে চলেছে এ কথাটা উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেননি। পড়াশুনা ছেড়ে বিয়ে করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তিনি আমায় অনেক কিছুই বোঝালেন। তাঁর কথার মধ্যে সতর্কতা আর বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পেলাম।

'আজকাল অনেকের জীবনেই কেমন যেন একটা উচ্ছৃঙ্খলতা এসে গেছে…এদের অনেককে আমি চিনিও; সব কিছুকেই অবজ্ঞায় উড়িয়ে দিতে এরা উন্মুখ। কিন্তু তাদের মায়েদের তাতে সান্ত্বনার কিছু আছে কি? তোমার কথা ভেবে ভেবে সারা রাত আমার চোখে ঘুম আসে না…'

কথা কয়টি শেষ করার আগেই ঠোঁট দুটি তাঁর কেঁপে উঠল—কপালের চামড়া কুঞ্চিত হওয়ায় রেখাগুলোকে সেখানে আরও গভীরতর মনে হচ্ছিল। অ্যাপ্রনটা চোখে চাপা দিয়ে বৃদ্ধা মহিলাদের মতো তিনি বিলাপ করে কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর ঠোঁট দুটোকে একত্রে চেপে তিনি আবার তার কান্না রোধ করলেন।

'এই সব উচ্ছৃঙ্খলের দল আজকাল ক্রমশই বেড়ে চলেছে—' কথা কয়টি

বলেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তিনি একবার আমার দিকে তাকালেন। 'জীবনের পক্ষে নিতান্তই লজ্জাকর···জনসাধারণ এদের ক্ষমা করবে না।'

কর্মকার বউর সেই বাঁকা চাউনির কথা মনে পড়ল। এ সংবাদটা শুনলে না জানি তার মুখের চেহারা আরও কেমন হবে।

'আর মাকে যদি কথাটা জানাতে হতো?' একবার ভাবতে চেষ্টা করলাম। তাঁর উপরে যে লজ্জা চাপাতে বসেছি তার জন্য কি আমার উপর তাঁর ঘৃণা ঘনিয়ে উঠত না—ঘৃণা আর ভয়? মায়ের স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে কি তিনি আর আমার দিকে তাকাতে পারতেন? আমাকে আপনার জন বলে স্বীকার করতে বাধ্‌ত নাকি তাঁর? আমার মধ্যে যে অনাগত জীবনের বিকাশ হচ্ছে তাকেই বা কোন্ ভাষায় তিনি অভিনন্দন জানাতেন।

শেষ পর্যন্ত কথাটা জানাব বলেই স্থির করলাম।

এরপর আরও একদিন আমার পাশে এসে তিনি বসলেন, কথা-বার্তা বলবেন বলে। আমার জন্য দুশ্চিন্তার তাঁর অন্ত নাই। আমি সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে ফেললাম—'মা আমি গর্ভবতী।'

কথাটা শুনতেই তার মুখের চেহারা ভয়ংকর রকম করুণ হয়ে উঠল। একটু হাসিও যেন ফুটেছিল তার মুখে। কারো হাতে মার খেয়ে ঠাট্টা করছে না ঠিকই মারছে, না বুঝে মানুষ যেমন হাসি হাসে এ হাসি সেই জাতের। তারপর হঠাৎ তাঁর সমস্তটাই মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি মৃদু-ভাবে বললেন,···'খুব আনন্দ দিলে আমায়·· মা হতে চলেছ···শিশু আসছে? ধন্যবাদ···এমনি আবর্জনা—' আর একটা কথাও তিনি উচ্চারণ করতে পারলেন না—দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় কপাটের সঙ্গে তার কাঁধের একটা ধাক্কা লাগল।

'এ নিয়ে তোমার যা খুশি কর; কেবল আমায় লজ্জায় ডুবিয়ো না—' বেড়ার ওপার থেকে তিনি কথা কয়টি বলে উঠলেন।

হঠাৎ পনর বছর আগেকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। সেদিনও প্রায় এই ধরনের কথাই তিনি বলেছিলেন। আমার ভাইয়ের বয়স তখন সবেমাত্র বার বছর। কোথা থেকে সে একটা কুকুর কুড়িয়ে এনেছিল পুষবে বলে। কুকুরের জন্য আলাদা খাবার জোগাড় করতে হবে বলে মা ভয়ংকর বিরক্ত হলেন। একদিন ভাইটি উদ্ধর্শ্বাসে দৌড়ে এসে মাকে জানাল: 'জিপসির' বাচ্চা হয়েছে। সংবাদটা শুনতেই রাগে চীৎকার করে উঠলেন মা,—'যা খুশি তাই কর তোমরা কেবল আমার চোখের সামনে যেন ওরা না আসে।'

সারাদিন ধরে কেঁদে কেটে—ঝগড়া করে শেষে সে কুকুরটার পাশে যেয়ে দাঁড়াল। 'জিপসি' তার বাচ্চাদের বুকে ঢেকে তখন নিশ্চিন্তে ঘরের এককোণে শুয়েছিল। ভাইকে দেখেই সে তার মুখের দিকে চোখ মেলে তাকাল। উঃ—কি সে করুণ দৃষ্টি! বশ্যতায় সে যেন একেবারে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে চায়। সেই দৃষ্টির কথা জীবনে কোনদিন ভুলব না।

ভাইটি বাচ্চাগুলোকে তুলে একটা থলিতে পুরে বাড়ীর পাশেকার একটা ডোবায় নিয়ে ডুবিয়ে দিল। কিছুতেই সে তার কান্না রোধ করতে পারছিল না। এই সারাটা সময় ধরেই জিপসি তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে হাত চেটে করুণ ভাবে তার কাছে কাতর মিনতি জানাল।

সেদিন মার কথা শুনে হঠাৎ আমার মনে হল: আমার ঘর নেই, পরিবার নেই। আমার নিজের মায়ের দৃষ্টি পর্যন্ত তাই আমার উপর বিষিয়ে উঠেছে...

এই ঘটনার পর আর গ্রামে বাস করতে পারি তেমন শক্তি আমার ছিল না; তাই শেষটায় আবার আমাকে মস্কোতেহ ফিরতে হল।

* *

যে বাড়ীতে জন্মেছিলাম সেই বাড়ী ছেড়ে যেদিন ফিরে এলাম সেই সকালটার কথা মনে পড়ে। জুলাই মাস। .সব চেয়ে গরমের সময়। সকাল নটা হতেই সূর্য আগুনের মতো তেতে উঠে।

ফিরে আসার পথে মস্কোকে দেখলাম। কারখানার ধোঁয়ায় আবছা নীলের মধ্য দিয়ে সোনালি গম্বুজগুলো চোখে পড়ল। দূর থেকেও শহরের ভাপ্সা গরমের ছোঁয়াচ অনুভব করলাম। ট্রেনের জানালায় মাঠ থেকে ছুটে আসা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল।

ষ্টেশন ছেড়ে বেড়িয়ে আসতেই রাস্তাব গুমট গরম আর গাড়ীর গ্যাসের দুর্গন্ধ অনুভব করলাম। ধোঁয়ায় আর ধূলায় সব আবহাওয়াটাই কেমন যেন ভারী। রাস্তার এখানে ওখানে মেরামতের কাজ চলছে। লম্বা লম্বা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে লোকজন 'অ্যাসফণ্টের' কড়াইগুলোর তদারকে ব্যস্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে এসে আশ্রয় নিলাম। দুটি মেয়ে আর একটি ছেলের মাত্র সাক্ষাৎ মিলল সেখানে। এরা তিনজনই ছাত্র কিন্তু গৃহহীন। মালপত্র মেঝের উপর নামিয়ে রেখে সেগুলোর উপরেই বসে পড়লাম। খানিকক্ষণের জন্য দৃষ্টি আমার শূন্যের দিকেই নিবদ্ধ হয়ে রইল।

ছাত্রাবাসের তত্বাবধানের ভারও মজুরদের হাতেই। নূতন রঙের গন্ধ পাচ্ছিলাম। মিস্ত্রীরা এখানে ওখানে আস্তর লাগাচ্ছে। করিডরের মেঝের উপর রাশি রাশি চুন স্তূপীকৃত হয়ে আছে। কেউ হাঁটতে গেলেই মেঝের উপর পায়ের চিহ্ন সাদা হয়ে ফুটে উঠে। যে ঘরটাতে আমার থাকার ব্যবস্থা হল তার মেঝের অবস্থাও ঠিক ঐ একই রকম।

লজ্জার হাত থেকে নিজেকে রেহাই দেব মনস্থ করে যেদিন হাসপাতালের পথে বেরিয়ে পড়লাম, সেই সকালটার কথাও ভুলব না কোনদিন জীবনে।

এ সব ব্যাপারে কোন কুসংস্কার আমার না থাকলেও কেন যেন সেদিন

নিজের অবস্থাটাকে আমার নিতান্তই দুর্ভাগ্য বলে মনে হয়েছিল। কেমন করে কি যে ঘটল কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করে কেবলই ভয় হচ্ছিল। গৃহহীন হয়ে যে বাড়ীটাতে আশ্রয় নিয়েছি সেখানে রাশি রাশি চুন আর সুরকি স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বাড়ীটার সংস্কারের কাজ তখনও শেষ হয় নি। এই অসহায় অবস্থার মধ্যে একটা নূতন অতিথিকে জগতে টেনে এনে আমি কি করব?

কথাটা চিন্তা করার পরেই,—আজের দিনে যা অনেকেরই করা উচিত, তাই করাই স্থির করে ফেললাম···হ্যাঁ, তাই করব বলেই উঠে পড়লাম। দু'হাতের তালু দিয়ে অনেকক্ষণ মাথাটাকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম পথে···

সবেমাত্র রাস্তায় জল ছিটানো হয়েছে। খানিকক্ষণের জন্য বেশ একটা ঝরঝরে সজীব ভাব জেগে উঠেছে সেখানে। পাথর বাঁধানো রাস্তার বুকে অগণিত ব্যস্ত মানুষের ভিড়। ভিজে রাস্তার স্পর্শে মানুষগুলোর মুখে চোখেও উৎসাহ ও সজীবতার দীপ্তি ফুটে উঠেছে। তাদের সবাই নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন হলেও সবাই মিলে একটা অবিচ্ছিন্ন জনস্রোতের সৃষ্টি করেছে।

সেই বিপুল জনস্রোতের অংশী হয়েও এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে আমি পথ চলছিলাম। আমার বেঁচে থাকার আর কোন অধিকারই যেন আর নেই। মনে হচ্ছিল যে উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চল্‌ছি তা যেন অনুমানে সবাই বুঝে নিয়েছে। সুতরাং প্রভাতের সজীবতার স্পর্শে জীবনের অস্তিত্বে সবাই যখন খুশিতে ভরপুর তখন নিজের লজ্জাকর অস্তিত্বে আমি অসহ্য বেদনা অনুভব করছিলাম। পথ চল্‌তে চল্‌তে চোরা চাউনিতে তাই রাস্তার দুধারে দরজার পাশে সংলগ্ন নাম ফলকগুলোকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম। আমার যেন ভয়ানক রকম কোন অসুখ করেছে। মনে হচ্ছিল আমি যেন সমাজ বিতাড়িত, সবার কাছে অবহেলিত, ঘৃণ্য।

শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে এসে পৌঁছে গেলাম। নিজের অবস্থা চিন্তা করার জন্য আরও খানিকটা সময় নেব বলেই যেন দরজার সামনে দিয়ে পায়চারি করতে শুরু করলাম। ভয়াবহ মুহূর্তটা যদি আরো খানিকক্ষণ দূরে সরিয়ে রাখা যায় মন্দ কি ?

হঠাৎ আবার মনে হল সেখানে আমার উপস্থিতির কারণটা যেন সবাই অনুমান করতে পেরেছে। পথ চলতে তাই সবাই চেয়ে দেখছিল আমার দিকে। কথাটা মনে হতেই এমন একটা ভাব দেখালাম যেন হাসপাতালের দরজায় কোনই প্রয়োজন নেই আমার, দেয়াল-সংলগ্ন লৌহ-কক্ষটাও আমার কাছে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়।

হঠাৎ মার সেই কথাগুলো আবার মনে পড়ল, 'এ নিয়ে যা খুশি কর।' থলিতে রুদ্ধ কুকুর ছানাগুলো প্রথমটায় না ডুবে যাওয়ায় আমার ভাই একটা কাঠি দিয়ে সেগুলোকে যেমন করে জলের নীচে ডুবিয়ে দিয়েছিল সেই ছবিটাও সঙ্গে সঙ্গে মনের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। 'জিপসির অবস্থাটা একবার ভাবতে চেষ্টা করলাম।'

কেন বলতে পারবনা কি·· প্রায় দৌড়েই বাড়ীতে ফিরে এলাম। তখন যে অনুভূতিটা মনে জেগেছিল সে অভিজ্ঞতার কথা জীবনে ভোলবার নয়। হঠাৎ শরীরের মধ্যে, নিজের দেহ ছাড়াও অন্য কিসের যেন একটা স্পন্দন অনুভব করলাম, একটা জীবন্ত কিছুর। সঙ্গে সঙ্গেই নিতান্তই আপনার জিনিস বলে চেনার একটা স্বর্গীয় অনুভূতিতে মন প্রাণ আমার ভরপুর হয়ে উঠল।

ঘরের এককোণে কোন রকমে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলাম। আমার মধ্যে যে জীবটির আবির্ভাব হয়েছে তার মধ্যে নিজেকে গোপন করে যেন আত্মরক্ষা করতে চাচ্ছিলাম। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে রইলাম। যাকে জীবন দিয়েছি তার হত্যা কামনা

করল যে জীবন সেই জীবনের কথা মনে করে ভয় জেগে উঠল আমার দৃষ্টিতে।

টানিয়া ও গ্লাসা ঘরে ঢুকেই ব্যাপার কি জানতে চাইল। বাড়ী থেকে ফিরে এলাম কেন এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেও ভুল করল না তারা।

নতজানু হয়ে বসে তাদের কাছে ঘটনাটা আনুপূর্বিক খুলে বললাম।

'কিন্তু তার জন্য কাঁদছ কেন? অন্যায় কিছু করনি ত তুমি।' কথা কয়টি বলেই সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে টানিয়া উপরের তলায় উঠে গেল। মেয়ে দুটির মধ্যে টানিয়াকেই অধিকতর প্রাণবতী বলে মনে হল।

'কন্‌ষ্ট্যান্‌টাইন, সোনিয়ার ছেলে হয়েছে', উৎফুল্ল ভাবে কথাটা বলেই একটি ছেলেকে সঙ্গে করে সে আবার নীচে নেমে এল।

কন্‌ষ্ট্যান্‌টাইন ঘরে ঢুকল বটে কিন্তু ব্যাপারটা তখনও তার কাছে রহস্যময়।

'কই ছেলে কই, কিসের ছেলে!' ঘরে ঢুকেই আমার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করল।

'এখনো ওখানেই আছে, শীগ্‌গিরই আসবে।' আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে টানিয়া উত্তর দিল। আনন্দের আতিশয্যে ও ছুটোছুটির পরিশ্রমে তখনও হাঁপাচ্ছিল সে।

মেয়ে দুটি এমন উত্তেজনাপূর্ণ উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকাল আমার দিকে যেন তাদের চোখের সামনে কোন রহস্যময় ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছিল;—তাদের ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে যার তাৎপর্য খুবই মহৎ ও নূতন। চারিদিকে রাশীকৃত চুন—অট্টালিকার সংস্কার.—নিজেদের গৃহহীন অবস্থা,—সমস্ত কিছুই যেন ভুলে গেছে তারা। গ্রীষ্মের ধূলি আর উত্তাপের মধ্যে এই বৃহৎ নগরে তারাও যে নিতান্তই নিঃসঙ্গ একথাটাও যেন মুছে গেছে তাদের স্মৃতি থেকে।

খুব স্পষ্ট করে অনুভব করলাম ব্যষ্টির উপর পরিবারের যে অত্যাচার তার হাত থেকে আমি রেহাই পেয়েছি—সেই অস্পষ্ট আর নোংরা অত্যাচারের কবল থেকে—আমার পক্ষে এটা নিতান্তই অভিনব ব্যাপার।

আর একটা বৃহৎ পরিবারের জীব হয়ে গেছি আমি—মানুষ পরিবারের। সেই নূতন পরিবারের সঙ্গে সংযোগ আমি খুব স্পষ্ট আর নিবিড়ভাবেই অনুভব করলাম।

যতদিন থেকে এখানে আছি—বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও বন্ধু বা কম্‌রেডের কাছ থেকেই কোন রকম অবজ্ঞা বা অবহেলা পাইনি আমি। তারা বরং আমার অবস্থাটাকে গতানুগতিক নীতিবাদের উপর জয় ঘোষণা বলে ধরে নিয়ে গর্বই অনুভব করছে। তারা বলছিল যে আমার এই অবস্থা দেখে কেবলমাত্র নীচমনা বুর্জোয়াদের পক্ষেই আঘাত পেয়ে আঁৎকে ওঠা স্বাভাবিক।

ছাত্রীদের কথা বলতে পারি, তারা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা অনেক সময়ই রুচিকর নয়। কিন্তু আমি কাছে এলেই তাদের সব খেলো হাসি তামাসা বন্ধ হয়ে যেত। তাদের মায়েদের কেউ এসেছেন এমনি একটা সম্ভ্রমের ভাব দেখাত তারা আমার প্রতি।

মনে হয় আমার স্বামী থাকলে হয়ত এত যত্ন এরা নিত না আমার জন্য। স্বামী না থাকার জন্যই আমার উপর তাদের এই সমবেত দায়িত্ববোধ।

কি করে তার দেখা পেলাম সেই কাহিনীটা শুনতে হয়তো তুমি উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছ। কিন্তু একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এই কথাগুলো আগে তোমায় শুনিয়ে নিলাম। কেননা এই কথাগুলো আগে থেকে জানা থাকলে আমাদের সাক্ষাতের ধরনটা বোঝা সহজ হবে।

এক সপ্তাহ আগের কথা। লালনাগার থেকে খোকাকে সঙ্গে করে

বেরিয়ে পড়লাম। কাজে বেরোবার সময় এই লালনাগারে খোকাকে রেখে যাই। আলেকজেন্দ্রা গার্ডেনে এসে বসে বসে পরের দিনের পড়া পড়ছিলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই বইয়ের মার্জিনে নোট টুকছিলাম।

বসন্তের প্রথম সময়টা। সবেমাত্র বরফ গলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাস্তার কলরবও অভিনব বলে মনে হচ্ছিল। তকতকে আবহাওয়ার বুক কেটে কাকের দল পাখা নাড়তে নাড়তে দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ঘুমভাঙ্গা মাছির আনাগোনা। আশেপাশের বাগান থেকে বসন্তের মিঠে রোদে ক্রীড়ারত শিশুদের হল্লা আর হাসির টুকরো ভেসে আসছিল। হাতে বোনা টুপি আর লম্বা মোজা-পরা শিশুর দল খেলার মাঠে রঙিন কাঠের কোদাল দিয়ে বালি খুঁড়ছে।

আমার খোকাও নীরব নয়। মধুর উত্তাপ আর সূর্যের আলোতে সে তার কচি হাত দুটো একবার খুলছে আবার বন্ধ করছে। আমি অধীর আগ্রহে তার কচি হাতের সেই লীলায়িত গতি লক্ষ্য করছিলাম। বসন্তের বুকে উৎসব আর জীবনের যে আনন্দময় অনুভূতি জেগেছে আমিও তার স্পর্শ থেকে বাদ পড়িনি।

বইয়ের একটা পাতা উল্‌টিয়ে উপরের দিকে মাথা তুলতেই তার উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। আনন্দে হৃদয় আমার লাফিয়ে উঠেছিল……

যে সৌম্য গাম্ভীর্য দেখে প্রথমদিন তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম আজও সেই গাম্ভীর্য্য দেখেই তাকে দূর থেকেও চিনতে পারলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় করিডরের উপর দিয়ে মাথা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়ে, ভ্রূকুঞ্চিত করে সে হেঁটে যেত। আজও সেই ভঙ্গিটা ওর চলায় অব্যাহত আছে দেখলাম। ওর পায়ের উঁচু বুট আর গায়ের নীল কোর্তাটাও চিনতে ভুল করিনি।

আমার চোখে চোখ পড়তেই সে ভয়ানক লজ্জিত হয়ে পড়ল—

রোদেপোড়া রঙের সজীব দীপ্তি যেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে কেমন যেন অপ্রতিভ বলে মনে হল—একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অবস্থাটাকে ভারি বিশ্রী মনে হচ্ছিল যেন ওর কাছে। আমাকে অভ্যর্থনা জানাবে, না না-দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে যাবে কিছুই যেন সে বুঝে উঠতে পারছিল না।

কিন্তু এক মুহূর্তেই দ্বিধা কেটে গেল। সে টুপিটা নামিয়ে আনতেই অনেকবার মাথা নেড়ে আমি তার অভিনন্দনে সম্মতি জানালাম।

এই যথেষ্ট। ভাবলাম আমার সামনাসামনি এসে সে হয়ত কোন কথাই বলতে পারবে না।

কিন্তু আমি ছুটে গিয়ে তার উপর অজস্র গালিবর্ষণ করলাম না দেখে সে বেশ একটু মুগ্ধই হল। সে হয়ত চেয়েছিল চলে যাবে কথা না বলেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠল না। আমাকে দেখার জন্য সে ঘাড় ফিরাল। আমিও ঠিক সেই মুহূর্তেই তার দিকে চোখ তুলে তাকালাম। হঠাৎ মত বদলে গেল তার। ধীরে ধীরে কাছে এসে সে তার হাতটা এগিয়ে দিল আমার দিকে। লজ্জার ভাবটা তখনও সে একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

আমার পোশাক আর জুতোর উপর তার চোরা দৃষ্টি আমার লক্ষ্য এড়ায়নি। আমি অভাবগ্রস্ত কিনা এইটাই সে বুঝে নিতে চাচ্ছিল। আমার সম্বন্ধে তার দায়িত্বের পরিমাণটা যেন তার জানা দরকার।

ইচ্ছা না থাকলেও বেঞ্চের নীচে পা দুটো লুকিয়ে ফেললাম। কেননা আমার জুতোর উপরে মস্ত একটা তালি লাগানো ছিল।

'সেই কতদিন আগে তোমার সঙ্গে দেখা। প্রায়ই এখানে আস বুঝি?' —বিশ্রীভাবে প্রশ্ন করল সে।

'আজকের মতো আবহাওয়া থাকলে রোজই আসি', আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যের আলোতে ভ্রূকুঞ্চিত করে জবাব দিলাম।

তার কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝলাম সে আনমনা নয় ;—আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে কতটা জোর আছে সেইটাই পরখ করে নিতে চাচ্ছে সে। আমাদের যোগ-সূত্রটা যে কেবল পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এটা সে নিশ্চিতভাবে জেনে নিতে চায়।

'আচ্ছা, যদি আবহাওয়া ভাল থাকে তাহলে কাল পর্যন্ত—' ভারি বিশ্রী ভাবে সে কথাটা শেষ করল ! 'আজ হঠাৎ আমি অত্যন্ত ব্যস্ত।'

লক্ষ্য করলাম সে খোকার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখ্‌লে। কিন্তু একটা কথাও উচ্চারণ করলো না সে সম্বন্ধে—যেন দেখ্‌তেই পায়নি তাকে।

সত্যি করেই সে ব্যস্ত ছিল বলে আমার মনে হল না। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে না পারাতেই সে আলোচনার সূত্রটাকে দীর্ঘ করে টান্‌বার দায়িত্ব নিতে চাচ্ছিল না। এতক্ষণও যে কোন হাঙ্গামা বাধেনি এতেই সে খুশি। খুব একটা স্বস্তির ভাব নিয়ে সে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলো।

হাসিমুখে উৎসুক হয়ে আমি তার সবগুলো কথা শুনছিলাম। খুব পরিচিত লোক—অথচ বহুদিন তার খোঁজ নেই, এমনি কারোর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে যখন জানতে পার সব দিক দিয়েই তার মঙ্গল, তখন তোমার মুখে যে ধরনের হাসি ফুটে ওঠে—আমার হাসির প্রকাশটাও ছিল সেই ধরনেরই।

নিজের সম্বন্ধে একটা কথাও তাকে বলিনি। পরিত্যক্ত হয়ে এতদিন যে নির্যাতন সহ্য করেছি তা নিয়েও কোন অভিযোগ বেরোয়নি আমার মুখ থেকে। এই নবাগত (খোকার) জীবনের সঙ্গে যে তার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সে ইঙ্গিতটুকু পর্যন্ত করতে কেমন যেন দ্বিধা বোধ করলাম। তাছাড়া সে যখন উঠে চলে গেল তখনও তাকে আটকাবার কোন রকম চেষ্টা করিনি।

বাড়ী ফিরে এসে ভারি ভাল লাগছিল। জীবনে আর একটা দিনও এমন স্বস্তি অনুভব করিনি। সব চেয়ে এই ব্যাপারটাই আমাকে খুশিতে ভরে দিল, যে তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নিয়ে একটা ইঙ্গিতও করিনি—অথবা সে আমাকে পরিত্যাগ করেছে বলেও কোন নালিশ জানাইনি তার কাছে।

তাছাড়া আরও একটু বিশেষ আনন্দ হচ্ছিল এই মনে করে যে, সাক্ষাতের প্রথমে লজ্জিত হয়েছিল সেইই, আমি নই। আমি কেবল বিস্মিতই হয়েছিলাম তাকে দেখে—হয়ত একটু খুশিও। কেন খুশি হয়েছিলাম যুক্তি দিয়ে হয়ত তার হদিস মিলবে না।

তার ভয় আর দুশ্চিন্তাটা যে নিতান্তই বাড়াবাড়ি এইটা প্রমাণ করতে পারায় কি আনন্দই যে পেয়েছিলাম সেদিন, ভাষায় তা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

সেও ঠিক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিল। ফলে অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সে অনেকটা সহজ হতে পারল।

পরের দিনও সে আবার এল। বাগানের একটা পথ ধরে আস্তে আস্তে আমাকে দূর থেকে দেখেই সে একটু হাস্লো। একটু পরেই হাসিমুখে একেবারে আমার সামনে এসে উপস্থিত।

আগেরদিনের অনিশ্চয়তা আর সতর্কতার ভাবটা তার কেটে গেছে দেখলাম। তার কাছ থেকে কোন কিছু দাবী করে আইনের আশ্রয় যে নেবনা সে-সম্বন্ধে সে তখন নিশ্চিত। তাছাড়া কোন অপ্রিয় ঘটনাও যে ঘটবার সম্ভাবনা নেই তাও সে বুঝতে পেরেছে।

বন্ধুর মতো শান্ত আর সরল ভাবেই সে আলাপ আরম্ভ করল। তবু তার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ভাব ফুটে উঠেছিল। সে যে আমার কাছে অপরাধী এ বিষয়ে সে সচেতন। কিন্তু সেই অপরাধের

জন্য আমি তাকে ক্ষমা করেছি কিনা, সে যেন ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছিল না। অথবা সে যে দায়ী আমার কাছে এই ভাবটা পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে এই ভয়েই হয়ত সে আলোচনাটাকে খুব ঘনিষ্ঠ করে তুলতে ভয় পাচ্ছিল।

আমার ছাত্রজীবনের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ এক সময় সে আমার মুখের উপর তার সম্পূর্ণ দৃষ্টিটা মেলে ধরল। আমি একটু না হেসে থাকতে পারলাম না। নিজের মধ্যে কি যেন একটা দমন করতে গিয়ে তার মুখটিও হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"সত্যি তুমি অদ্ভুত"—একটু বিস্মিত ভাবেই সে কথাটা উচ্চারণ করল। তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা যে কি সেটা যেন সে ঠিক মতো তখনও বুঝে উঠতে পারেনি। তবে তার উপর যে আমার কোন বিদ্বেষ নেই সে সম্বন্ধে সে নিশ্চিত।

একটা ব্যাপার কিন্তু আমরা উভয়েই এড়িয়ে চলছিলাম। সে হলো খোকা। সে কিংবা আমি কেউই খোকাকে নিয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করিনি এ পর্যন্ত। তবে এসম্বন্ধে তার যে একটা প্রবল ঔৎসুক্য আছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে নিয়ে কোন কথা আরম্ভ করাও তার পক্ষে খুবই শক্ত। তবু লক্ষ্য করলাম তার চোখ দুটো বার বারই খোকার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে আবার আমার দিকে চেয়ে দেখছিল। কি একটা ব্যাপার যেন সে ঠিক মতো অনুধাবন করতে পারছিল না।

এ ছাড়াও আমার বর্তমান জীবনযাত্রা এবং আমি কি ধরনের লোক সে সম্বন্ধে তার একটা ঔৎসুক্য লক্ষ্য করলাম। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি? স্ত্রী,—তার ছেলের মা—অথবা কোনই সম্পর্ক নেই? তার কাছে আমি কে? আপনার কেউ অথবা কেউ নই?

সে যখন বার বার খোকাকে চেয়ে দেখছিল তখন তার দিকে চোখ পড়তেই সে এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিল যেন খোকাকে ছাড়া অন্য কিছু সে লক্ষ্য করছে। শিশুটি সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য পাছে আমার কাছে ধরা পড়ে এই ভয়ে সে সব সময়ই সতর্ক।

আমি যেন কিছুই বুঝতে পারিনি এমনি ভাবেই তার সঙ্গে আলাপ করে চল্‌লাম—'প্রচুর সূর্যের আলো আছে এমনি একটা জায়গায় কাজের সন্ধানে যাব ভাবছি।'

লোকে বলে: নতুন যারা বাবা হয়েছে তারা তাদের খোকাদের দিকে প্রথম প্রথম তাকাতে নির্দোষ লজ্জা অনুভব করে। ওরা যে তাদেরই সন্তান এই কথাটা যতদিন না তারা ভাবতে অভ্যস্ত হয় ততদিন তাদের পক্ষে লজ্জিত আর অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে ওঠা মুস্কিল।

অবশ্য তার ব্যাপারটা অন্য ধরনের। খোকা সম্বন্ধে সে আমার কাছে অপরাধী। এই জন্যই বোধ হয় এগিয়ে কোন কথা তোলবার সাহস সে সঞ্চয় করে উঠতে পারছিল না। তাকে যে এ ব্যাপারে দায়ী করবো না একথা নিশ্চিত ভাবে জেনেও না।

পুরো একটা ঘণ্টা আমার পাশে কাটিয়ে তারপর সে চলে গেল। যাবার সময় আমার কাঁধের উপর হাত রেখে খানিকক্ষণ নীরবে চেয়ে রইল সে আমার দিকে। তারপর হঠাৎ বলে উঠল: "কি সুন্দরী মেয়েই না তুমি।"

গতকাল শেষ পর্যন্ত আমরা সব চেয়ে শক্ত প্রসঙ্গটা নিয়ে কথা বললাম। যাক শেষ পর্যন্ত বাধা অতিক্রম করতে সমর্থ হলাম আমরা।

আমি খোকাকে কোলে তুলে নিতেই সে আপন মনে খেলা করতে শুরু করে দিল। মোটা মোটা কচি হাত দুখানি সে একবার খুলছিল, আবার বন্ধ করছিল। হঠাৎ এক সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে সে আলেক-জেণ্ডারের নাকটা ধরে ফেলল।

"না না……ব্যথা দেয়না 'বাবা' ", খোকার হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বললাম আমি।

'বাবা' কথাটা উচ্চারিত হতেই আলেকজেণ্ডার কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পড়ল লক্ষ্য করলাম। আধ-বোজা চোখের একপাশ দিয়ে সে একবার চেয়ে দেখল আমাকে। আমি না দেখার ভান করে চুপ করে রইলাম।

"ওকে আমার বলছ কেন তুমি?" কথাটা বলেই সে হাসতে লাগল।

"কেন, নিশ্চয়ই বলব"—সরল ভাবেই জবাব দিলাম।

"বেশ…ওযে একজন নাগরিক!" কণ্ঠস্বরে অতিরিক্ত একটা শ্লেষের ভাব এনে সে কথাটা উচ্চারণ করলো—যেন এই দিয়ে নিজের অপ্রতিভ বিশ্রী অবস্থাটাকে সে চাপা দিতে চায়।

সে বোধ হয় চেয়েছিল যে, স্বামী আর পিতা হিসাবে তাকে ধরে নিয়ে তার সঙ্গে আমি অনেক কিছু আলোচনা করব। কিন্তু সেদিক থেকে কোন কথাই বলিনি তাকে। খোকাকে আবার মাটীতে নামিয়ে দিয়ে শাসন করার ভাবে তার দিকে একটা আঙুল তুলে ধরলাম। তারপর আলেকজেণ্ডারের সঙ্গে অন্য বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হলো, আমার নানা রকম পরিকল্পনা সম্বন্ধে, খোকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। অবশ্য খোকাকে তার বাবার সঙ্গে জড়িয়ে কোন কথাই বলিনি আমি।

এতক্ষণ ধরে মাথা নীচু করে চুপ করে বসেছিল সে—বুটের মাথা দুটো এমন ভাবে নাড়াচাড়া করছিল যেন কোন একটা বিষয় নিয়ে খুবই বিপর্যস্ত। মাঝে মাঝে ঠোঁটও কামড়াচ্ছিল।

"সে যাই হোক ওর সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক ত আছে অন্তত?" সে বললো। মাথাটা তার তখনও সামনের দিকেই ঝোঁকানো।

"আছে হয়ত কিন্তু খুবই সামান্য"—আমি উত্তর দিলাম, "এমন কিছু সম্বন্ধ নয় যা জানতে পেলে খুশি হবে ও।"

কথাটা শুনেই কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। শুকনো গলায় প্রশ্ন করল : "তাহলে কবে যাচ্ছ তোমার নতুন……তোমার নতুন কাজে ?"

"দিন পনেরোর মধ্যেই হয়তো…বার্ডচেরী যখন ফুটতে শুরু করবে", হাসতে হাসতে জবাব দিলাম।

তার শরীরটা কেমন যেন একটু কেঁপে উঠল। আমি কি ভেবে কথাটা বললাম সে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

"তোমার ঠিকানাটা আমায় দেবে বোধ হয় ?" কথাটা বলেই বুটের মাথা দিয়ে মাটী খুঁড়তে খুঁড়তে সে আমার উত্তরের অপেক্ষায় বসে রইল।

আমি তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিলাম না। "একেবারে দৃষ্টির বাইরে চলে না যাও এইটুকুই মাত্র আমি চাই"—তাড়াতাড়ি করে শেষের কথাটাকে সে যোগ করে দিল। আমার দ্বিধাকে অস্বীকৃতি বলে ধরে নিয়ে সে রীতিমত লজ্জিত হয়ে পড়েছিল।

"না না তা কেন হবে ?" আমি উত্তর দিলাম।

তাকে তক্ষুনি ট্রেন ধরতে হবে, সুতরাং আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিদায়ের সময় সত্যি অকপট ভাবে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলাম। কিন্তু কোনও কারণে, তার সঙ্গে দেখা হবে কি না জিজ্ঞাসা করিনি।

আমার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সে অনেকক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল—প্রথমে একটা তারপর দুটো চোখের দিকেই। প্রীতিপূর্ণ হাসি ছাড়া আরও কিছু যেন সে আবিষ্কার করতে চাচ্ছিল সেখান থেকে।

শেষ পর্যন্ত বেশ জোরেই সে আমার হাতটার উপর একটা চাপ দিল—পুরুষের মতো করেই। তারপর নীরবে ধীরে ধীরে চলে গেল সে আমার কাছ থেকে—একবারও পিছনে ফিরে তাকাল না। আমিও বাড়ী ফিরে এলাম।

সারাটা সন্ধ্যা ভরে এই সাক্ষাতের ব্যাপার নিয়ে নানা ভাবে চিন্তা করে দেখলাম। নিজেকে প্রশ্ন করলাম: "কাজটি কি ভালো হল?" এখনও ঠিক বলতে পারি না……তবে সে চলে যাওয়াতে যে বিষণ্ণ হইনি এ নিশ্চিত। কোন রকম অস্থিরতা বা বেদনাও অনুভব করিনি তার জন্যে, বরং একটা নতুন ধরনের শক্তির স্পর্শ অনুভব করেছি—পরিপূর্ণতার—মুক্তির।

তার সত

বিদায়সম্মেলনটাকে বেশ সাফল্যমণ্ডিতই বলা যেতে পারে। পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় ছাত্ররা যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে! লেনা গ্লানের বড় ঘরটাকে নৃত্য-গীতের উচ্ছল আনন্দে তারা মুখর করে তুলল। কোথায় কেমন করে যে এর পরিসমাপ্তি হবে সে নিয়ে কেউ চিন্তা করারও প্রয়োজন অনুভব করেনি।

উৎসবের মাঝামাঝি কে একজন দরজার কড়া নাড়ল। লেনা এগিয়ে গেল দরজাটা খুলে দিতে! ফিরে আসতেই তার মুখে দেখা গেল বিরক্তির ছাপ—অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথির আবির্ভাবে মানুষের মুখে যে ধরনের বিরক্তি দেখা যায়।

নবাগতের নাম ভিক্টর জরিন—স্কুলেরই একজন ছাত্র। কিছুদিন আগেই মাত্র লেনার সঙ্গে তার পরিচয়। সেই থেকে ব্যর্থতার ঈর্ষা নিয়ে সে লেনার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লেনা কিন্তু ওকে এখন মোটেই সহ্য করতে পারে না; ওর সঙ্গে দেখা হলেই ভারি একটা অসোয়াস্তি অনুভব করে।

ওর কদর্যতা আর লজ্জালুতা,—আনন্দে উচ্ছল হবার অসামর্থ্য আর বিমর্ষতা লেনাকে নিরুৎসাহ করেছে। সে যে বিশ্বাসী আর চতুর, সকলের চেয়ে ভদ্র একথাও লেনা জানে; তবু ওর উপর থেকে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেনি।

ঘরে ঢুকেই উপস্থিত সবাইকে অপ্রতিভভাবে অভিনন্দন জানাল ভিক্টর। গ্রহলস্কি সাইমন ওকে লক্ষ্য করে কি যেন একটু ঠাট্টা করল। উপযুক্ত উত্তর খুঁজে না পেয়ে মাথার চুলগুলোকে পিছনের দিকে সরাতে সরাতে এক কোণে চুপ করে বসে পড়ল সে।

ভদ্রতার খাতিরেও লেনা একবারও তার কাছ দিয়ে ঘেঁষল না। ভিক্টরের উপস্থিতির পরেও তাকে বেশ খুশি আর জীবন্ত মনে হচ্ছিল, মাথায় কোঁকড়ানো সোনালী চুলের প্রাচুর্য—দেহে যৌবনের উচ্ছল মাদকতা। সব চেয়ে বেশি হাসছিলও সে। অনেকক্ষণ ধরে নেচে হয়রান হয়ে একটা সোফায় গা এলিয়ে দিল—তারপর একখানা রুমাল দিয়ে বাতাস করতে লাগল নিজেকেই।

ভিক্টরের অশ্রান্ত নীরব স্তুতি আর অনুস্মৃতির উপর বিরক্তি ধরে গেছে লেনার। ওর দিকে তাকাবারও সময় নেই তার। কিন্তু তবু ভিক্টর কাছে এলেই কেন যেন সে নিজেকে অধিকতর সুন্দর আর জীবন্ত করে তুলতে চায়।

সাইমন গ্রহলস্কির গায়ে ছাত্রদের জ্যাকেট আর কালো সার্ট। সব চেয়ে বেশি ইয়ার্কি দিচ্ছিল সে লেনার সঙ্গে। নতজানু হয়ে কখনো ফল এগিয়ে দিচ্ছিল তাকে···কখনো বা সোফায় বসে লেনার কোমর জড়িয়ে ধরছিল। তার স্ত্রী লিজাও উপস্থিত ছিল সেখানে। বেশ পাতলা করে 'চুলো-মুখো' মেয়েটি। খুশির আতিশয্যে হাসি তার উছলে উঠছিল সবার চেয়ে বেশি। আপেল কাড়াকাড়ির সময়ও তার সঙ্গে কারো পারবার উপায়

নেই। হাত পা নেড়ে জয়ের উল্লাসে আর সবাইকে সে হার মানিয়ে দেয়।

লেনা লক্ষ্য করেছে ভিক্টরের দৃষ্টি সারাটা সন্ধ্যা তার অনুসরণ করে ফিরেছে। কিন্তু বুঝেও না বোঝার ভান করে সে তার দৃষ্টি এড়িয়ে চলেছে। ইচ্ছা করেই সে তাকে বুঝতে দিচ্ছিল যে, গ্রহলস্কিকে নিয়েই সে ব্যস্ত। এমন কি সভার মধ্য থেকে গ্রহলস্কির হাত ধরে টেনে একরকম দৌড়েই সে তাকে করিডরের দিকে নিয়ে গেল। তার আকস্মিক আকর্ষণে আর একটু হলেই অন্যের পা ঠেকে হোঁচট খেয়েছিল আর কি গ্রহলস্কি। একটু পরেই ভেসে এল করিডর থেকে অনেকক্ষণ স্থায়ী একটা হাসির স্রোত—নিজের সুখের আতিশয্য অন্যকে জানাতে মেয়েরা যেমন করে হাসে। নিজের বিমর্ষতা, ভালবাসা আর ঈর্ষা দিয়ে অন্যের আনন্দকে বিস্বাদ করে তোলে না যারা তাদের কতখানি ভালবাসে লেনা এই কথাটাই যেন জানাতে চাচ্ছিল সে সেই হাসির মধ্য দিয়ে।

একটু পরেই হাসি থামল। তারপর কিছুক্ষণের জন্য কোন সাড়াশব্দ নেই। উপস্থিত সকলেই মাঝে মাঝে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছিল ভিক্টরের দিকে। তাদের দৃষ্টি এড়াতে সে পাংশু মুখে টেবিল-ক্লথের ঝালর নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করল।

'স্বামীর খোঁজ খবর নাও'—কে একজন বলে উঠল লিজাকে। অজস্র হাসির টুকরো ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়।

'সে নিয়ে তোমায় চিন্তা করতে হবে না। আমাদের ব্যাপার আমরা ভাল জানি।'—উত্তর দিল লিজা।

এই ত কথার মত কথা। তা নইলে আর আধুনিকা কেন? কথাটা আর অগ্রসর হল না বটে কিন্তু সবাই কেমন যেন একটা উত্তেজনা অনুভব করছিল মনে। লেনা আর গ্রহলস্কির অনুপস্থিতির সময়টা ক্রমশঃই দীর্ঘ হয়ে পড়ছিল।

হঠাৎ ভিক্টর উঠে নীরবে করিডরের দিকে বেরিয়ে চলে গেল।

ঘরভরা নিস্তব্ধতা। উপস্থিত সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল আর তাকাচ্ছিল ব্যস্তভাবে দরজার দিকে।

খানিকক্ষণ পরে লেনা ফিরল—পিছনে গ্রহলস্কি। 'যাক, হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। চলে গেছে সে'—বলল লেনা। তারপরেই আবার যোগ করল—'একেবারে হয়রান হয়ে গেছি আমি ওর উৎপাতে।'

'কেন? দোষ ত তোমারি, ওকে চুমু খেতে গিয়েছিলে কেন'—উত্তর দিল লিজা।

'লোকটা যে এমন এ আমি তখন ধারণাই করতে পারিনি। হঠাৎ একদিন চুমু খেতে পেয়েই যে আমার উপর তার দাবী আছে বলে মনে করবে, কিংবা আমার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াবে এ কেমন করে জানব ভাই?'

'না হয় বুঝলাম তখন জাননি। কিন্তু এখন ওকে পছন্দই বা করনা কেন? লোকটা ত বেশ গম্ভীর—চতুর, তাছাড়া বেশ ভদ্রও। আমার স্বামী ওর অর্ধেকটা হলেও ত বাঁচতাম।'

বিস্ময়ে সাইমন গ্রহলস্কি ভ্রূ কুঁচকিয়ে চারদিকের লোকগুলোর দিকে চেয়ে দেখল একবার। তারপর একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে একচুমুকেই এক গ্লাস ভোডকা শেষ করে ফেলল।

'পছন্দ করব কি করে বল? আমার সর্ত মেনে নিতে অক্ষম সে'—লেনা উত্তর দিল।

'তোমার সর্ত কি?'

'আমার স্বাধীনতায় যে হাত দেবে তেমন লোকের আমার প্রয়োজন নেই। ভারি অসহিষ্ণু লোকটা'—লেনা বলল—'আমার সর্ত হল, আমার উপর কারো দাবী আছে এ আমি প্রতিমুহূর্তে অনুভব করতে রাজি নই।

তাছাড়া আমার যেমন খুশি চলব, ফিরব কিংবা জীবন কাটাব তাতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। এদিক দিয়ে তোমার সাইমনকে আদর্শ মানুষ বলতে পারি।'

কথাগুলো শেষ হতেই সাইমন আর একগ্লাস ভোডকা নিঃশেষ করল।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল লিজা—'আর আমি, আমি—আদর্শ নই?'

'তুমিও নিশ্চয়—তোমার ত তুলনাই নেই।'

'দেখলে না তোমাদের অবাধ প্রেমলীলা চোখে দেখেও কেমন নীরবে হজম করলাম।'

সোফাটার দিকে ছুটে গিয়ে লেনা লিজাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

'এর অর্থ কি এই যে কোন মেয়ের প্রেমে গুরুত্ব থাকবে না?'—একটি সরল মেয়ে প্রশ্ন করল। মেয়েটির গায়ে একটি পুরনো পশমের পোশাক। এতক্ষণ দূরে বসে সে নীরবে তাদের লক্ষ্য করছিল। কথাটা বলেই সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। ভালবাসার কথা বললে সাদাসিদে মেয়েরা সাধারণতঃ লজ্জিত হয়েই পড়ে। তাদের মনে হয় কেউ যেন হঠাৎ বলে উঠবে এসব আলোচনায় মাথা ঢোকাও কেন? এবং সত্যি করে তার কথা শুনে দু'একজন মুখ টিপে হেসেও উঠল।

'তোমার ভালবাসা বোধহয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কেমন?'—প্রায় ঠাট্টার স্বরেই বলে উঠল গ্রহলস্কি। কথাটাকে উপলক্ষ করে এবার সকলে সশব্দেই হাসবার সুযোগ পেল।

'আমার সঙ্গে ও-সব গুরুত্ব-টুরুত্ব নেই প্রেমের ব্যাপারে। অবশ্য ছোটবেলায় মা আমাকে খুবই ভালবাসতেন। এখন বড় হয়েছি সুতরাং সে ভালবাসার এখন কোনই প্রয়োজন নেই।'

'আচ্ছা—ভিক্টর চলে গেছে বলে তোমার মন খারাপ হয়নি?'—সেই সরল মেয়েটি আবার প্রশ্ন করল।

'আমার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ ক'রে ও আমার বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছে। অন্যের সঙ্গে একটা কথা বলতে গেলেও ওর মনে ব্যথা লাগে। এ নিতান্তই অসহ্য আমার পক্ষে। আমায় কেউ শাসন করবে এ আমি মেনে নিতে রাজি নই।'

'প্রকৃত ভালবাসার ক্ষেত্রে অন্যের ইচ্ছার কাছে নিজেদের বিলিয়ে দেওয়া এমন কিছুই কঠিন নয়!'—সরল মেয়েটি বলল। কথাটা শেষ হতেই হঠাৎ তার মনে হল হয়ত সবাই ভাবছে—তোমার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না কি না তাই যে-কারো কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলেই তুমি খুশি। কথাটা মনে হতেই লজ্জায় সে আবার অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

'চুলোয় যাক তোমার দর্শন।'—লেনা বলল—'আমি চাই উজ্জ্বল আনন্দ।'

ভিক্টর চলে যাওয়ার পরেই ঘরের আবহাওয়ায় একটা পরিবর্তন নেমে এল। লেনার উজ্জ্বল আনন্দেও আগের সে অবস্থা আর ফিরে এল না। ভিক্টর চলে যাবার সময় অনেকেই তার চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি লক্ষ্য করেছে। এমন কি লেনাকেও শেষ পর্যন্ত জোর করে আনন্দের ভান করতে হচ্ছিল। এই ঘটনায় তার মনে যে কোন দাগ লাগেনি এ প্রমাণ করতে আনন্দে উচ্ছল না হয়ে তার উপায় ছিল না। মনের বিধ্বস্ত অবস্থাটাকে হাসির আবরণে ঢেকে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল সে।

দুটো বাজতেই সবাই উঠতে শুরু করল। এবার পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা। করিডরে ঠেলাঠেলি—ভিড়। গ্রহলক্ষ্মির ঠাট্টা বিদ্রূপ। প্রতিবেশীদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় পাছে তাই সবার মুখের হাসিই চাপা। একটু পরেই তারা পথে নেমে এল।

পশমের জ্যাকেটটা গায়ে জড়িয়ে লেনাও খানিকটা এগিয়ে গেল

তাদের সঙ্গে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় খানিকটা ঘুরে আসার প্রয়োজন অনুভব করছিল সে। ইতিমধ্যে গুমট ধোঁয়া জানালার পথে বেরিয়ে গেলে ঘরটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সকলের পিছনে গ্রহলক্ষ্মির সঙ্গে লেনা। লিজা সামনের দলে কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। তার হাসি অশ্রান্ত। কথায় শূন্য রাস্তাটাও ভরে উঠেছে।

একটা চৌরাস্তার কাছে আসতেই তারা থেমে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। কি যেন একটু আলাপ করল লেনা গ্রহলক্ষ্মির সঙ্গে। তারপর অন্য সবার সঙ্গে করমর্দন করে'—রুমাল উড়িয়ে সে বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাল।

বাসার কাছাকাছি আসতেই পাশের একটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে ভিক্টর দাঁড়াল তার সামনে।

লেনা থমকে পথের উপরেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ে তার শরীর কাঁপছিল। একটু পরেই সোজা এগিয়ে গেল সে ভিক্টরের দিকে। তার মন বিদ্রোহী—এই বিরামহীন বিরক্তি সে কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নয়।

অন্যের উপস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে জানে না এই লোকটা—সে ক্ষমতাই নেই তার। তাই একলা পেলে মানুষের সামনে বেরিয়ে আসে সে।

'কি ব্যাপার কি ?'—বেশ একটু বিরক্ত ভাবেই প্রশ্ন করল লেনা।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'কি সম্বন্ধে কথা বলতে চাও।'

'সে তো তুমিই জান।'

'না—আমি জানিনা কিছুই।'

'বেশ, বলছি তাহলে। এস এগোই।'

কাঁধটাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে লেনা অনিচ্ছার সঙ্গে এগিয়ে চলল।

'তুমি জান তোমাকে ভালবাসি আমি।'—ভিক্টর বলল।

বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল লেনার সারা শরীরে।

'তুমি নিশ্চয়ই জান'—টুপিটা হাতে করে হাঁটতে হাঁটতে বলে চলল ভিক্টর। মাথার চুলগুলো অনবরত পিছনের দিকে সরিয়ে দিচ্ছিল সে। 'এবং এও তুমি জান যে বাজে ইয়ার্কি আমি পছন্দ করি না। গ্রহলস্কির মত ভাঁড়ামি করতে আমি অক্ষম ও তো একটা সঙ।'

'তাতে তোমার কি? আচার, এগুলো এমন কিছু দোষের নয়'—বেশ একটু রাগের সঙ্গেই উত্তর দিল লেনা।

'শিষ্টতার চেয়ে এই সবকে তুমি পছন্দ কর বেশি?'

'কি পছন্দ করি বা না করি, সে আমি তোমাকে বলতে বাধ্য নই। তাছাড়া আমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করবারও কোন অধিকার নেই তোমার।'

'নিশ্চয়ই আছে।'

'ও—তাই নাকি—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কোথেকে পেলে এ অধিকার?'

'তোমার প্রতি আমার গভীর ভালবাসা থেকে।'

'এ আমার সর্তের বাইরে। গুরুগম্ভীর আর বিরক্তিকর জিনিস অত্যাচারেরই নামান্তর।'

'তাহলে তুমি চাও কেবল উড়ে বেড়াতে?'—ভিক্টর বলল—'আজ একজনের সঙ্গে প্রেম করবে আবার কালই ভিড়বে অন্যের সঙ্গে?'

'আমার যা ইচ্ছা তাই করব। একটা নির্জীব মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর চেয়ে, এই আমি পছন্দ করি বেশি।'

'তাহলে তুমি একনিষ্ঠতা চাও না—চাও ছ্যাবলামি আর হাল্কা আমোদ? যে বাজে ইয়ার্কি মেরে তোমাকে খুশি করতে পারবে সেই তোমার প্রিয়?'

'বাইরের ব্যবহার দেখে তুমি কাউকে বিচার করতে পার না। লোকের সামনে হয়ত একজন ভাঁড়ামি করতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে একান্তে…'

'ব্যক্তিগত ভাবে'—'একান্তে', 'এসব মানে?' সন্দিগ্ধ ভাবেই জিজ্ঞাসা করল ভিক্টর। হঠাৎ কেন যেন মুখ তার বিবর্ণ হয়ে উঠল।

'যাক, কিছুই নয়।' কথাটা কেটে দিল লেনা।

'আমি জানতাম না যে, তাকে একান্তে ব্যক্তিগতভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে তোমার। এ আমার কাছে একটা নতুন সংবাদ।'

এর উত্তরে লেনা বলতে চেয়েছিল যে, আজের রাত্রি ছাড়া একান্তে সে তার সান্নিধ্যে যায়নি। নিতান্ত রহস্যের ভান করেই তারা করিডরে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার কথাবার্তায় সে বুঝেছে খুবই ভাল মানুষ সে। কিন্তু ভিক্টরের উপর রাগে ও ঘৃণায় এ-কথাগুলো সে বলতে পারল না! বরং ভিক্টর যাতে জ্বলেপুড়ে মরে সেই জন্যই সে তাকে বোঝাতে চাইল যে, করিডরে গ্রহলস্কির সঙ্গে অদৃশ্য হওয়াটা তার নিতান্তই সন্দেহজনক।

'তাহলে গ্রহলস্কিকে সঙ্গে করে করিডরে গিয়েছিলে নিজে ইচ্ছা করেই?'—বেশ একটু রাগের সঙ্গেই বলল ভিক্টর।

'নিশ্চয়ই, ইচ্ছা করেই তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম।' লেনাও উদ্ধত ভাবেই জবাব দিল।

'এই ব্যাপারটা করার আগে আমার চলে যাওয়াটা পর্যন্তও অপেক্ষা করতে পারলে না?'

'আবার সেই পুরনো কাহিনী', অসহ্য বিরক্তিতে খেঁকিয়ে উঠল লেনা। 'যতদূর স্পষ্ট করে বলা সম্ভব বলেছি—তোমাকে আমি চাই না—ভালবাসি না তোমাকে। আমার সর্ত মেনে নেয়ার ক্ষমতা নেই তোমার।'

'কেন ?'—পথের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ভিক্টর। তার গলা বন্ধ হয়ে আসতে চাচ্ছিল।

এই লোকটার উপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা বোধ করছিল লেনা। কথায় কথায় কৈফিয়ৎ দাবী, যার কোন ব্যাখ্যা চলে না এমন সব কথার উত্তর চাই। সে ত দাসখত লিখে দেয়নি তাকে। এ অন্যায় আব্দার কেন ? বিরক্তিতে,—রাগে অনেক রূঢ় কথা বলে ফেলল সে।

'যে হেতু তুমি আমার স্বাধীনতার পথে বিঘ্ন—আমার পিছনে পিছনে সব সময় অনুসরণ কর—তোমাকে এড়িয়ে একটি পাও ফেলবার উপায় নেই আমার···যেহেতু তুমি মানুষ হিসাবে···আমার চোখে বিরক্তিকর···এখন বুঝলে কেন ?' সকলের শেষে বলল লেনা।

ভিক্টর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে তার মুখের রং কাগজের মত সাদা হয়ে গেল ; তারা তখন একটা পুলের উপর এসে দাঁড়িয়েছে—ভিক্টরের দৃষ্টি নদীর দিকে প্রসারিত, লেনা দাঁড়িয়ে আছে নদীর দিকে পিছন দিয়ে।

'তাহলে এই শেষ কথা ?'—বেশ শান্ত ভাবেই প্রশ্ন করল ভিক্টর।

'তোমার কাছে এখনো পরিষ্কার হয়নি বুঝি কথাগুলো ?'

ভিক্টর নীরবে তাকাল তার দিকে। লেনার চোখে তার প্রতি ঘৃণার আভাস স্পষ্ট। কেমন যেন একটা বোঝার মত ভার বোধ করছিল সে বুকের মধ্যে। তার মাথায় ঝড় চলেছে। লেনার ঘৃণাপূর্ণ চোখ দুটোর দিকে সে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। ইচ্ছা হচ্ছিল ওই চোখ দুটোকে নিভিয়ে দেয় সে—আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় লেনার মুখটাকে। সহ্য করবার ক্ষমতা তার লুপ্ত।

'যাও জাহান্নামে যাও'—বলে সে লেনার বুকের উপর মারল একটা প্রচণ্ড ধাক্কা।

পুলটার এক কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল লেনা তখন। ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ পিছনের দিকে হেলে পড়ল সে—টাল সামলাতে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে চেষ্টা করল একবার। কিন্তু ভিক্টরের মাথায় তখন খুন চেপেছে—ভয়ংকর চিন্তায় সে ক্ষিপ্ত।

'না অপেক্ষা কর—' চীৎকার করে উঠল সে লেনার সামনে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা জোরে ধাক্কা দিল সে লেনাকে।

টাল সামলাতে গিয়ে লেনা তার জামার হাতাটা আঁকড়ে ধরল।

'আমি তোমার কাছে বিরক্তিকর নয়?'—লেনার জামার সামনেটা চেপে ধরে প্রশ্ন করল সে।

'একশবার বিরক্তিকর—দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে'—রাগে রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিল লেনা। অনেক বিষ উদ্গারণেরই ইচ্ছা ছিল তার। কি করছে না বুঝে ভিক্টর আবার তার বুকে একটা ধাক্কা দিল। পুলের রেলিং টপকে ভিক্টরের জামার হাতা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে নীচের দিকে ঝুলে পড়ল লেনা। তার চোখে আসন্ন মৃত্যুভয়। রাগে অন্ধ ভিক্টর জোর করে ছিনিয়ে আনল তার হাতাটা লেনার হাত থেকে।

পর মুহূর্তেই বুঝল, পুলের উপর একলা দাঁড়িয়ে আছে সে। নীচে ঝুপ করে লেনার দেহটা জলের উপর আছড়ে পড়ল। বেশ স্পষ্ট শুনতে পেল সে জলের সেই আলোড়নের শব্দ!

ভয়ে তার চোখ নিষ্পলক। খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে সামনের দিকে। জলের দিকে তাকাবার সাহস হল না তার। মাথাটা হাতে চেপে ধরে হঠাৎ সে পুলের উপর থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে প্রথম যে ট্রেন পেল সেই ট্রেনেই ভিক্টর দেশে চলে গেল। মফস্বলের ছোট একটা শহরে তাদের বাড়ী। সেখান থেকে খুব বেশি দূরেও নয়। কিন্তু সারাটা পথই তার কাটল ভয়ানক একটা উদ্বেগে। গাড়ীর কামরা ছেড়ে কোথাও বাইরে পর্যন্ত বেরোতে সে সাহস পেলনা। নূতন কোন যাত্রী কামরায় এসে ঢুকলেই তার শরীর কেঁপে ওঠে। সৈনিকের পোশাকপরা কাউকে জানালার পাশ ঘেঁযে চলে যেতে দেখলেও শঙ্কায় তার বুক দুরু দুরু করতে থাকে। বাইরের দৃশ্য দেখছে যেন এমন ভাব করে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইল সে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে চাচ্ছিল সবার দৃষ্টি থেকে নিজের মুখটাকে আড়াল করে রাখতে—পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে।

হঠাৎ একবার তার মনে হল—'যদি ধরা পড়ি তা হলে কি হবে?' যাই হোক না কেন—জীবন তার নিঃশেষিত। নিজের ভালবাসার পাত্রীকে সে নিজহাতে ডুবিয়ে মেরেছে। এখন আর তার ভয়ের কি আছে? বেঁচে থেকেই বা লাভ কি?

কিন্তু তবু সে ভয় পেলে—

তিন সপ্তাহ সময়মাত্র সে বাড়ীতে ছিল। কিন্তু কি দুঃসহ যন্ত্রণাই না সে অনুভব করেছে এই কয়টি দিন। দিন আর কাটতে চায়নি। তার মা বোন কতবার জিজ্ঞাসা করেছে তাকে তার এই বিমর্ষতার কারণ। নানা অজুহাতে সে তাদের প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে। কিন্তু তবু তারা নিশ্চিত হতে পারেনি। দিনের পর দিন তাকে লক্ষ্য করেছে। তাদের এই অনুসন্ধিৎসাই তার জীবনকে করে তুলেছিল সবচেয়ে বেশি দুর্বহ।

ভিক্টরের মা বুড়ো হয়েছেন। একদিন গির্জা থেকে ফিরেই তিনি পুত্রকে চুমু খেলেন। পুত্রের কল্যাণকামনায় প্রার্থনা জানালেন মনে মনে।

ভিক্টর তখন তার পড়বার ঘরে টেবিলের সামনে ব্যস্ততার ভান করে বসে ছিল। হঠাৎ তার মনে হল, মা ত জানলেন না যে একজন খুনীকে তিনি চুমু খেলেন।

প্রতিদিন সকালবেলা খবরের কাগজখানা হাতে নিতেই তার হাত কেঁপে ওঠে। ত্রস্ততায় তার চোখ ঘুরে বেড়ায় সংবাদ স্তম্ভগুলোর উপর দিয়ে। তার ভয় হয় তার কৃতকর্ম বুঝি আত্মপ্রকাশ করেছে সংবাদের রূপ নিয়ে।

একদিন কাগজখানা খুলতেই হঠাৎ তার চুলগুলো প্রায় খাড়া হয়ে উঠল।

একটা সংবাদ আছে—মস্কোর এক নদীতে একটি নারীর গলিত দেহ পাওয়া গিয়াছে। তাহার মাথার খুলিটা চুর্ণিতপ্রায়। নারীর গলিত দেহ···এ দেহটাই ছিল একদিন তার··এইত একমাস আগেই! এই মেয়েটিকে একদিন সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। আজ সে মৃত, কিন্তু তবু তার জন্যই আজ তার এই অবস্থা—তাকে অতখানি ভালবাসে বলেই। সে···একটা গলিত দেহ? সে কি ভালবাসত? গ্রুহলস্কির সঙ্গে কি ঘটেছিল তার করিডরে সেই চিত্রটা মনে মনে আঁকতে চেষ্টা করল সে—পারল না। চোখের সামনে একটা ধূসর আবছায়া। তার প্রতি বিরক্তির জন্যই হয়ত গ্রুহলস্কিকে সে সেদিন আদর করেছিল দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে।

ঠিক একটা জায়গাতেই অনেকক্ষণ ধরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল সে। অবোধ্য কি একটা যেন সে আবিষ্কার করতে চায়—তার সঙ্গে পরিচয়ও নেই এমন একটা নূতন কিছুকে চায় সে বুঝে নিতে। সেই মেয়েটিই আজ······একটা গলিত দেহ।

তার পক্ষে জীবন ক্রমশই অধিকতর দুর্বহ হয়ে উঠতে লাগল। মাঠে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, চোখে পাগলের শূন্য

দৃষ্টি। হাতের আঙুলগুলো চাপতে চাপতে বিড় বিড় করতে থাকে সে—আমি তোমাকে ভালবাসি···কিন্তু তুমি ত আজ নেই···একটা গলিত দেহ···উঃ সেই শেষ মুহূর্তটাকে যদি আবার ফিরিয়ে আনতে পারতাম···তোমায় পূর্ণ স্বাধীনতা দিতাম। কোন বন্ধন অনুভব করতে হত না তোমাকে আমার জন্য—আমি হতাম তোমার সব চেয়ে অনুগত বন্ধু—যা বলতে মেনে নিতাম, সব কিছু বুঝতাম।

'হ্যাঁরে ভিক্টর, এসব তুই কি বলিস?'—একদিন তার মা প্রশ্ন করলেন।

আয়নায় নিজের দিকে চেয়ে হঠাৎ একদিন সে আবিষ্কার করল তার মাথার সামনে অনেকগুলো চুল সাদা হয়ে গেছে।

তার মা আর বোন যেদিন থেকে বুঝতে পেরেছেন যে সে তাদের কাছ থেকে কোন কিছু গোপন করছে, সেদিন থেকে তার অবস্থা হল আরো গুরুতর।

এ অবস্থায় বেশিদিন চলা অসম্ভব। তার কেবলি মনে হচ্ছিল বেশিদিন আর বেঁচে থেকে লাভ নেই। লেনা নেই। তার উপর পুঞ্জীভূত ঘৃণা নিয়ে সে জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে। তবে মিছামিছি চাকুরী আর জীবিকা নিয়ে সে মাথা ঘামাবে কেন? না—এ অসম্ভব।

প্রেম কি? কোথায় এর রহস্য? সে যদি জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষও হতো তবু লেনা তাকে ভালবাসত না। কিন্তু দুর্বৃত্ত এমনকি খুনীও ত নারীর ভালবাসা পায়। তাহলে প্রেমের এই অভিশপ্ত রহস্য কি? কেন সে তাকে ভালবাসতে শিখল? লেনা ত তাকে ভালবাসেনি। সে কেবল দিয়েছে দুঃখ আর যন্ত্রণা—ঈর্ষার বেদনা। তবু কেন তাকে সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি? কেন? সে ভাবী ডাক্তার। সে জানে অলৌকিক ব'লে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, কিন্তু এটা কোন্ শক্তি?

মানুষের চরিত্রের কিংবা নীতির কোন সম্বন্ধ নেই এর সঙ্গে—দৈহিক গুণের ত নেইই। তবে কিসের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এর। জীবিত থাকতে সে যে দাবী করেছিল সে যদি তার সব কিছুও দিতে পারতো—তবু—তবুও সে পেতনা তার ভালবাসা।

ভিক্টরের কেবলি মনে হচ্ছিল এই অবস্থায় আর অধিকদিন তার বাঁচা অসম্ভব। লেনার ভীতিবিহ্বল মুখখানা যেখানে সে শেষবারের মত দেখেছে,—যেখানে সে তার জামার হাতাটা তার হাত থেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়েছে সেই জায়গাটা সে আর একবার দেখবে গিয়ে···তারপর বিষ খেয়ে সব কিছুর শেষ করে দেবে।

মস্কোতে পৌঁছেই স্টেশন থেকে সোজা সে সেই পুলটার দিকে চলে গেল।

সন্ধ্যার বুকে স্তব্ধতা জমে উঠেছে। সব কিছুই আগের মতো। অস্বাভাবিক কিছুই নেই। এইখানটায় যে কিছু একটা ঘটেছে তার চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। জেলেরা হাঁটু পর্যন্ত পায়জামা গুটিয়ে রেখে নদীতে মাছ ধরছে—ধোপানীরা দুই ঊরুর ফাঁকে স্কার্টটাকে চেপে ধরে পাথরের উপর কাপড় আছড়াচ্ছে। কাছেই একটা গির্জা থেকে সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টা বাজল। নদীর স্বচ্ছ বুক সন্ধ্যার মাধুর্যে প্রশান্ত।

ভিক্টর নদীর দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল। তার বুকে ধক্ ধক্ করে শব্দ হচ্ছিল।

এই সেই জায়গা···নীচু রেলিংটা। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে নীচের দিকে তাকাল। সব কিছুই অন্ধকার মনে হচ্ছিল তার চোখের সামনে—কিছুই সে দেখছিল না। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার তার চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েছিল মনে নেই তার। আবার সে নীচের দিকে তাকালে। যে পাথরখানায় আছড়ে পড়ে মাথাটা তার চূর্ণ হয়ে গেছে সেই পাথরখানাকে খুঁজছিল সে। কিন্তু একখানা পাথরেরও অস্তিত্ব নেই নীচে ;—আছে কেবল জলের অপূর্ব নিস্তব্ধতা।

'উঃ—আবার যদি সেই মুহূর্তটাকে ফিরিয়ে আনতে পারতাম…।'

হঠাৎ ঘাড়টা ফিরাতেই একখানা চলন্ত ট্রামে জীবন্ত লেনার মুখ দেখতে পেল সে।

ঠিক যেন লেনারই মুখ—তবে তার চেয়ে আর একটু শীর্ণ আর পাংশু। মুখের অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র। সহজ সরল উজ্জ্বলতা আর উচ্ছলতা নেই তাতে—কেমন যেন বিশীর্ণ আর মলিন।

হঠাৎ ট্রামের পিছনে পিছনে দৌড়াতে শুরু করল ভিক্টর। অস্বাভাবিক উত্তেজনায় সে আর স্থির হয়ে থাকতে পারল না। একটা ব্যাপার সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত এখন। সে যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সে যখন মস্কোতেই আছে তখন কোন মতেই জীবন নষ্ট করবে না সে। কিন্তু এই কি লেনা? তা কেমন করে হবে? নিশ্চয়ই অন্য কেউ। সে হতেই পারে না…কিন্তু সবই একরকম---একই বা হতে পারে কেমন করে?

বাসায় ফিরে এসে সারারাত্রি সে ঘরময় পায়চারি করে কাটাল। ভোর হতেই লেনা যে রাস্তায় থাকত সেই রাস্তাটার উপর নেমে এল সে। ঐ সেই মোড়টা যেখানে সে সেদিন রাত্রে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। ঐ সেই বাড়ী—বাড়ীতে ঢোকবার রাস্তা, আর ঐত…ঐ ত লেনা নিজেই…

কিন্তু কি করে হতে পারে?…কাল যে মেয়েটিকে সে ট্রামে দেখেছে সেই মেয়েটিই দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে এল। মাথা নীচু করে তারই দিকে

এগিয়ে আসছিল সে। তার খুব কাছাকাছি এসেই যন্ত্রচালিতের মতো সে মাথা তুলল—হঠাৎ তার গালদুটো সাদাটে হয়ে গেল যেন। কিন্তু থামল না সে। চলন্ত জনস্রোতের সঙ্গে মিশে দ্রুত পাশ কাটিয়ে গেল সে তাকে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একবার হাতটা ওঠাল ভিক্টর—চীৎকার করে ডাকতে যাচ্ছিল হয় ত তাকে, আর নয় ত চাচ্ছিল টুপিটা ওঠাতে।

অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটির পথের দিকে চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভিক্টর লেনাকে নদীতে ফেলে দেওয়ার পর একজন পাহারাওলা তাকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

কি করে নদীতে পড়ল জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিয়েছিল—'পুলের উপর দাঁড়িয়ে ছিল সে, হঠাৎ পা ফস্‌কে নীচে পড়ে গেছে।' নিজেই সে বুঝতে পারল না কেন সে সত্য গোপন করল। বন্ধুদের বলল ডুবসাঁতার কাটতে আঘাত পেয়েছে সে।

অনেক পরিবর্তন হয়েছে তার। আগের সেই উচ্ছল হাসি আজ আর নেই তার মুখে। বেড়াতে বেরোলে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে সে পথ চলে। কি একটা সমস্যা যেন তাকে পেয়ে বসেছে—কিছুতেই সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না সে।

সে নিজেকেও প্রশ্ন করেছে—'তাকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার কথাটা কেন সে গোপন করল? তাছাড়া কথাটা পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে সেজন্যই বা তার এত ভয় কেন?' কোনই উত্তর পায়নি সে।

আরো একটা প্রশ্ন তাকে মাঝে মাঝে পীড়া দেয়—'যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সেই শেষ পর্যন্ত এত ঘৃণা করতে পারে যে খুনের চেষ্টা করতে পর্যন্ত পিছ্‌পা হয় না। তখনই পাহারাওলা এসে না পড়লে সে ডুবেই

মরত। আচ্ছা এখন যদি ভিক্টরের সঙ্গে তার দেখা হয় তাহলেও কি সে তাকে ঘৃণা করবে? কিন্তু এই ঘৃণা ত ভালবাসার ব্যর্থতার থেকেই উদ্ভূত।'

তার বর্তমান অনুভূতিগুলি সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। তবে সে জানে ভিক্টরকে এখন আর সে ঘৃণা করে না। আজ তার সব চেয়ে বড় চিন্তা, সে এখন কোথায় আছে। না জানি কি অবস্থায় দিন কাটছে তার।

সে হয়ত মস্কোতেই আছে এখনো। কথাটা মনে হতেই ভয়ানক একটা চাঞ্চল্য অনুভব করল সে মনে। বহুদিন বাড়ী ছাড়া, আত্মীয়স্বজন যাকে মৃত বলে ধরে রেখেছে, এমনি কেউ যখন বাড়ীতে ফিরে আসে তার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তখন যে ধরনের অনুভূতি জাগে মানুষের মনে লেনার মনেও তেমনি ভাবান্তর হল।

যে বাড়ীটাতে ভিক্টর থাকত সেই বাড়ীতে গিয়ে পর্যন্ত একদিন লেনা ঘুরে এল—যদি তার দেখা পাওয়া যায়; কিন্তু দেখা পেল না তার। ভিতরে ঢুকে খোঁজ নেবারও সাহস হল না।

সেই ভয়ংকর বিদায়ের পরে এখন দেখা হলেই বা আর লাভ কি?

এমন আপনার জন নয় সে যে তাকে দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠবে। তার উপস্থিতি প্রেতের আর্ভিাবের মতই মনে হবে হয়ত তার কাছে। নূতন করে সে আরো তার রাগের কারণ হবে। যেদিন সে তাকে ঠেলে ফেলে সেদিন যে ভয়ানক ঘৃণা সে দেখেছিল তার চোখে সেই ঘৃণাই হয়ত আবার উঠবে তার চোখে ফুটে। উঃ—কি ভয়ংকর দৃষ্টি।

তার সঙ্গে সে নাই বা কথা বলল—তাকে লক্ষ্য না করলেও ক্ষতি নেই। মানুষের যেমন ইচ্ছা হয় মৃত্যুর পরে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কি করে জীবন কাটাচ্ছে লেনাও তেমনি

চায় চুপ করে তাকে দেখে আসতে। আচ্ছা যদি কেউ সত্যি করেই মৃত্যুর পরে পৃথিবীর দিকে ফিরে তাকায় তবে সে তার আত্মীয়দের মুখে কোন শোকের চিহ্ন দেখতে পাবে কি? কিংবা অন্ত্যেষ্টির পরেই জীবনের কোলাহলে এসে সব কিছু ভুলে যায় তারা?

ভুলেই যদি যায় তবে কি ভয়ংকর সেই বিস্মৃতি! যতক্ষণ বেঁচে থাকে মানুষ—ভালবাসা—লোকের আনাগোনা—দুদিনের বিচ্ছেদেও কত দুঃখ, বেদনা,—ফিরে এলে আবার আনন্দের উচ্ছ্বাস; তারপর যেই মৃত্যু এল··· সেকি উচ্ছ্বসিত শোক···সহমরণের আকাঙ্ক্ষা, মন কিছুতেই সান্ত্বনা মানতে চায় না। কিন্তু তবু শোকগ্রস্ত আবার ঘরে ফিরে আসে—আত্মীয়-স্বজনবা সান্ত্বনা দেয়—সবার অনুরোধে উপরোধে আহার্য গ্রহণ করে। কিন্তু পরের দিনই খাবার জন্য আর অনুরোধ করতে হয় না। মৃতের স্মৃতি ধীরে ধীরে মন থেকে মুছে যায়। এর পরেও যদি কেউ মৃতের জন্য দুঃখ করে কিংবা তাকে মনে রাখে, একটা সামান্য পেয়ালা ভাঙলেও সেই মুহূর্তের জন্য অন্ততঃ তার মন থেকে সে মুছে যায়। যে জীবিত সে সবসময় মনে করিয়ে দিচ্ছে তোমাকে তার নিজের অস্তিত্ব। তাই তাকে ভালবাস,—তাকে ভুলতে পার না পাছে সে দুঃখিত হয়। কিন্তু মৃতের কথা মনে করিয়ে দেবে কে?

কথাগুলো মনে হতেই মানুষের হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞতা লেনার মনকে ভয়ানক নাড়া দিল,—এর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই তার। সবার পর একটা পেয়ালা ভাঙলেও যদি মৃতের স্মৃতি মন থেকে মুছে যায় তবে পৃথিবীতে কি আর রইল আঁকড়ে ধরে থাকবার।

লেনার মনে হল সে যেন সত্যি মরে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। কিন্তু কই কেউ তো শোক করেনি তার জন্যে। তার পরিচিত মানুষেরা তাকে অভ্যর্থনা করল বটে কিন্তু দরদ নেই সে অভ্যর্থনায়। আর সত্যি করেই যদি সে মরত, তাহলে বড় জোর সে আশা করতে পারে এরা বলবে

—'কি দুঃখের কথা···অমন একটা ভাল মেয়ে···মরে গেল'। পর মুহূর্তেই হয়ত এরা আলোচনা করবে গ্রীষ্মের ছুটিটা কাটানর পক্ষে কোন্ জায়গাটা সব চেয়ে ভাল।

অ· পারে দাঁড়িয়ে সে যেন জীবনকে দেখল নূতন দৃষ্টিতে। এখন কাউকেই চোখে পড়ল না তার সারা জগতে, যে তার কথা মনে করে রাখবে।

মৃত্যুর পরপারে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে দেখে বুঝল জগতে তার প্রয়োজন নেই,—সে আছে কি নেই তাতেও কারোই কিছুই আসে যায় না। কথাটা মনে হতেই সমস্ত চেতনা তার শির শির করে উঠল।

ভিক্টরের সঙ্গে দেখা হতেই হঠাৎ কেমন যেন একটা উত্তেজনা অনুভব করল সে। সে দৃষ্টির বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারল না যে; তার মুখের অভিব্যক্তিটা পর্যন্ত সে লক্ষ্য করেনি।

সেই সাক্ষাতের পর ভিক্টর প্রতিদিনই গিয়ে তার জানালার দিকে তাকিয়ে থাকত। এক একদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত তার সেই অবস্থায়। একদিন সে দেখল—পর্দাটা নড়ছে। কার একখানা হাত যেন জানালাটা খুলতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল হাতখানা।

ভিক্টরের বুক কাঁপতে লাগল,—উত্তেজনায় কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করছিল,—কানে ঝিঁঝিঁর ডাকের মত একটা ঝাপ্সা শব্দ শুনছিল সে। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল,—হয়ত সে তাকে লক্ষ্য করবে। কিন্তু পর্দার আড়ালে যে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে দেখা সম্ভব নয়।